Transportation Engineering- 2

Subject Code: 26473

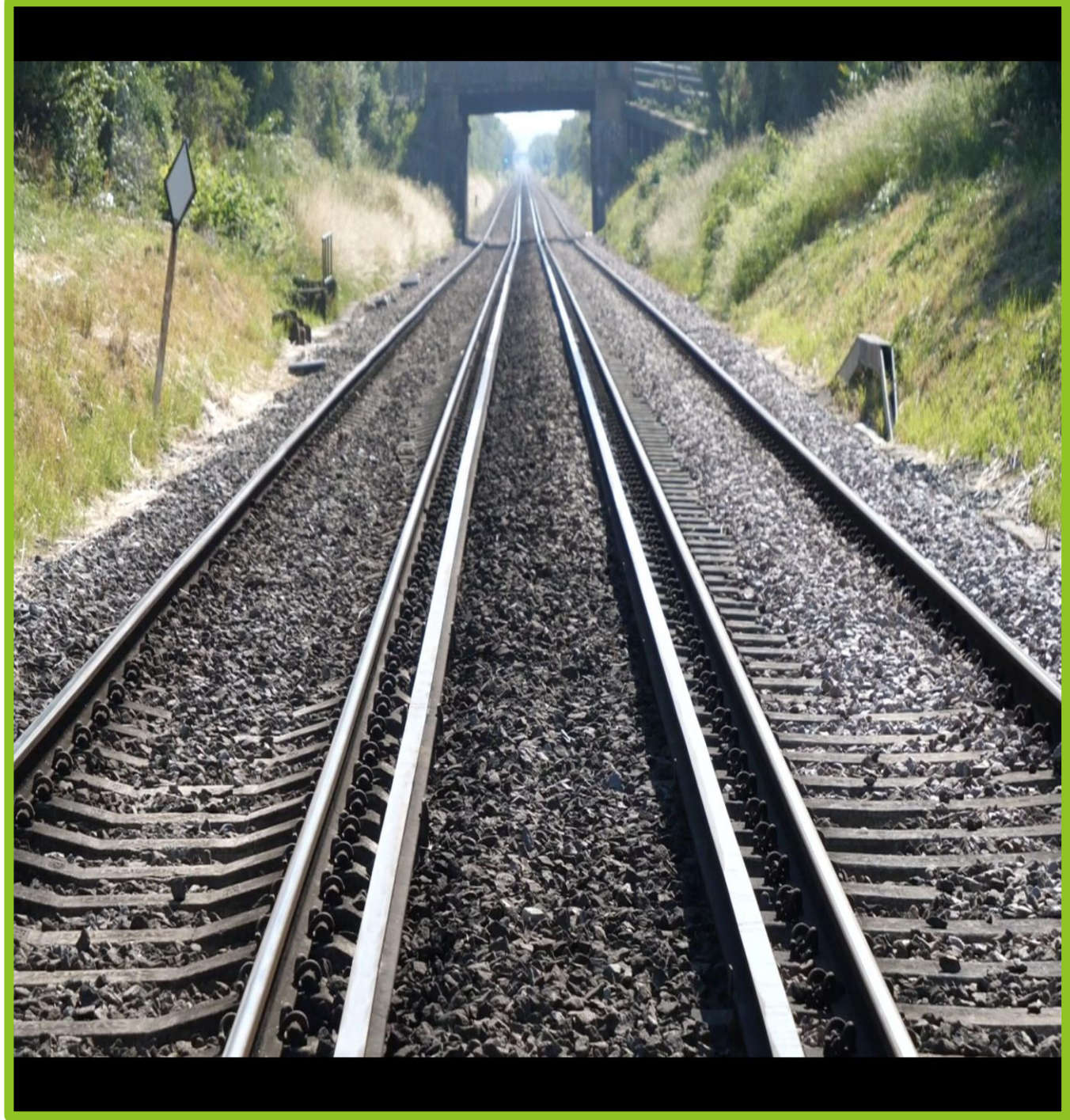

স্বাগতম

অধ্যায়ের নাম:
রেলপথ ও রেলপথ
জরিপের ইতিহাস

সিভিল

৭ম পর্ব

ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-২

বিষয় কোড - ২৬৪৭৩

উপস্থাপনায়

মোঃ ফরহাদ আলী
খন্ডকালীন শিক্ষক (সিভিল টেকনোলজি)
ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইন্সিটিটিউট

farhadali786bd@gmail.com

প্রথম অধ্যায়
রেলপথ ও রেলপথ জরিপের ইতিহাস

১.০ ভূমিকা (Introduction):

সূচনা লগ্ন থেকেই মানুষ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। এই ঘুরে বেড়ানো খুব সহজসাধ্য নয়। মানুষের সাথে মালপত্র থাকে। এগুলো বহন করা এবং নিজে আরাম করে খাওয়ার জন্য বাহন প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা থেকে গরু, ঘোড়া, উট ইত্যাদি পোষ মানিয়ে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এদের গতি ছিল কম এবং মালপত্র বহন করত অল্প পরিমাণ। তাই মানুষ ভাবতে লাগল কীভাবে আরো দ্রুত ও বেশি মালপত্র বহন করা যায়। এভাবে আবিষ্কার হলো চাকা। এরই ধারাবাহিকতায় আবিষ্কার হলো রেলগাড়ি।

১.১ রেল সড়কের ইতিহাস বর্ণনা (Describe a Brief History of Railways):

বেল সড়কের প্রথম উৎপত্তি হয় ইংল্যান্ডে। চার চাকার গাড়িগুলো সর্বোচ্চ 13 কি.মি. থেকে 16 কি.মি. গতিবেগে চলাচল। করতো। 1784 সালে ঘোড়ার টানা চার চাকার গাড়ির প্রবর্তন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন অখ্যাত ব্যক্তি বোঝা বহনের জন্য প্রথম চাকার গাড়ির প্রবর্তন করেন যা ঘোড়া কাঠের তক্তার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যেত এবং এ থেকেই বর্তমান রেলপথের সূচনা। কিছুদিন পর হতে স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য কাঠের পাতের উপর লোহার বেড় দেওয়া শুরু হয়। নতুন রেলপথ তৈরিতে ব্যবহৃত শব্দ প্লেট স্থাপন এখান থেকেই উদ্ভব হয়।

1789 সাল থেকে পাথর খণ্ডের উপর ঢালাই লোহার পাত ব্যবহার করা শুরু হয় এবং অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই আধুনিক রেলপথের ধারণা পূর্ণতা পায়। ঘোড়া অনেক বেশি ভারবহনে সক্ষম ছিল বলে এ পদ্ধতি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীতে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ঘোড়ার স্থান দখল করে। ধারণা করা হয় নিকোলাস যোসেফ কাগনট (Nicholas Joseph cugnot) নামক একজন ফরাসি ম্যাকানিক 1769 সালে প্রথম বাষ্পীয় রেলের স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন।

এর পর পরই উইলিয়াম মারডক নামের একজন স্কটিশ এবং রিচার্ড ট্রেভিথিক নামের একজন Cornish ইঞ্জিনিয়ার রেলের বাষ্পীয় স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিনের মডেল তৈরি করেন। এ সমস্ত স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন সড়কপথে পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত হতো। 1804 সালে ট্রিভিথিক প্রথম রেলপথের জন্য স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন তৈরি করেন। 1804 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ওয়েলস এর মার্থার নামক ছোট শহর হতে ট্রিভিথিক এর বাষ্পীয় ইঞ্জিন লোহার পরিপূর্ণ চটি ওয়াগন এবং 70 জন লোক নিয়ে যাত্রা শুরু করে। মার্থার হতে যাত্রা করে উপত্যকার মধ্য দিয়ে ট্রেনটি দুই ঘন্টায় 14.5 কি. মি. পথ অতিক্রম করে অন্য প্রান্তে পৌছায়।

পরবর্তীতে ট্রিভিথিক অন্য একটি ইঞ্জিন তৈরি করেন এবং তা লন্ডনে নিয়ে যান। এভাবে অনেক ব্যক্তিরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ইঞ্জিন তৈরি করেন। কিন্তু এ ইঞ্জিনগুলো ততটা উন্নত ছিল না এবং সেগুলো মাঝামাঝি ভেঙে যেত অথবা প্রায়ই প্লেটগুলোর ক্ষতিসাধন করতো। কিন্তু খুব শীঘ্রই পাতগুলোর উন্নতিসাধন করা হলো এবং লোহার পাতগুলোই বেল নামে পরিচিত হল। জর্জ স্টিফেনসনকে (1781–1848) সবচাইতে বিখ্যাত রেলপথের পথিকৃৎ। বলে মনে করা হয়। তিনি 1781 সালের 9 জুন নিউক্যাসেল অন টাইপত্রের সিকি ওয়েলম শহরে জন্মগ্রহণ করেন, তার পিতা ছিলেন একজন খনি শ্রমিক।

তিনি কখনই স্কুলে যাননি। কিন্তু নিজে নিজেই লিখতে এবং পড়তে শিখেছিলেন। তিনি উত্তর ইংল্যান্ডের একটা রেলপথে কাজ করতেন এবং তিনি ইঞ্জিন খুব পছন্দ করতেন। যদিও জর্জ স্টিফেনসন স্বয়ংক্রিয় রেল ইঞ্জিন (Locomotive) বা রেলপথ আবিষ্কার করেননি কিন্তু তিনি আধুনিক রেলপথের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 1848 সালে 68 বছর বয়সে তিনি ধনী এবং বিখ্যাত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। 1825 সালের 27 সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডে প্রথম জনগণের জন্য রেলপথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। রেলপথটি ডারহামের স্টকটোন এবং ডাবলিংটন এর মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল।

রেলপথটির পরিকল্পনা এবং নকশা প্রস্তুত করেছিলেন স্টিফেনসন এই অভূতপূর্ব অর্জন দেখতে হাজার হাজার লোক জড় হয়েছিল। লোকোমোশন-1 (Locomotion-1) নামের ইঞ্জিনটিয় ওজন ছিল মাত্র 6.6 টন কিন্তু এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ণ 30টি ওয়াগন নিয়ে প্রথম যাত্রা শুরু করে এবং রেলপথ্য খারাপ থাকা সত্ত্বেও এটা 19.32 কি. মি./ঘন্টা গতিবেগ অর্জন করে। পরবর্তীতে ট্রিভিথিক অন্য একটি ইঞ্জিন তৈরি করেন এবং তা লন্ডনে নিয়ে যান। এভাবে অনেক ব্যক্তিরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ইঞ্জিন তৈরি করেন।

কিন্তু এ ইঞ্জিনগুলো ততটা উন্নত ছিল না এবং সেগুলো মাঝামাঝি ভেঙে যেত অথবা প্রায়ই প্লেটগুলোর ক্ষতিসাধন করতো। কিন্তু খুব শীঘ্রই পাতগুলোর উন্নতিসাধন করা হলো এবং লোহার পাতগুলোই বেল নামে পরিচিত হল। জর্জ স্টিফেনসনকে (1781–1848) সবচাইতে বিখ্যাত রেলপথের পথিকৃৎ। বলে মনে করা হয়। তিনি 1781 সালের 9 জুন নিউক্যাসেল অন টাইপত্রের সিকি ওয়েলম শহরে জন্মগ্রহণ করেন, তার পিতা ছিলেন একজন খনি শ্রমিক। তিনি কখনই স্কুলে যাননি। কিন্তু নিজে নিজেই লিখতে এবং পড়তে শিখেছিলেন। তিনি উত্তর ইংল্যান্ডের একটা রেলপথে কাজ করতেন এবং তিনি ইঞ্জিন খুব পছন্দ করতেন।

যদিও জর্জ স্টিফেনসন স্বয়ংক্রিয় রেল ইঞ্জিন (Locomotive) বা রেলপথ আবিষ্কার করেননি কিন্তু তিনি আধুনিক রেলপথের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 1848 সালে 68 বছর বয়সে তিনি ধনী এবং বিখ্যাত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। 1825 সালের 27 সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডে প্রথম জনগণের জন্য রেলপথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। রেলপথটি ডারহামের স্টকটোন এবং ডাবলিংটন এর মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। রেলপথটির পরিকল্পনা এবং নকশা প্রস্তুত করেছিলেন স্টিফেনসন এই অভূতপূর্ব অর্জন দেখতে হাজার হাজার লোক জড় হয়েছিল। লোকোমোশন-1 (Locomotion-1) নামের ইঞ্জিনটিয় ওজন ছিল মাত্র 6.6 টন কিন্তু এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের দ্বারা পূর্ণ 30টি ওয়াগন নিয়ে প্রথম যাত্রা শুরু করে এবং রেলপথ্য খারাপ থাকা সত্ত্বেও এটা 19.32 কি. মি./ঘন্টা গতিবেগ অর্জন করে।

কিন্তু রিস্টফেনসনের বংশীয় স্বয়ংক্রিয় হেল ইঞ্জিন (Steam Locomotive) এর ধারণাকে অনেকে বাধা দেন। 1829 সালে কোমর ধনী সর্বোল্লাম লোকোমোটিভ (Locomotive) প্রস্তুত এবং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নিম্নলিখিত সৈশিষ্যের আলোকে।

(1)ইঞ্জিন প্রস্তুত খরচ ১০ পাউন্ড এর বেশি হবে না।

(2) ইঞ্জিন এর সর্বোচ্চ ওজন 6.10 টন।

(3) ইজিন 4:57 টন এর বেশি হলে অবশ্যই ছয় চাকা সমৃদ্ধ হবে।

(4) নিঃসরিত ধোঁয়া অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিন গ্রহণ করবে।

(5) 16:09 কি. মি./ঘন্টা গতিবেগে ইঞ্জিনটির 20.32 টন ওজন বহন করার ক্ষমতা থাকতে হবে। 500 পাউন্ড পুরস্কার পাবার প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত এটি ইঞ্জিন অংশগ্রহণ করে।

(i) স্টিফেনসন লোকামোটিভ রকেট (Stephenson Locomative Rocket)

(ii) রেখওয়েট অ্যান্ড এরিকসন লোকেমোটিভ নোভেলটি (Braithwaite and ericsson locomative Novelty)

(iii) টিমথি হ্যাকওয়ার্থ লোকোমোটিভ ম্যানসপেরিল (Timothy Heckworth-locomotive mansparil)

(iv) বার্সটল লোকোমোটিভ পারসিভারেন্স (Burstall locomotive persiverance)

লিভারপুল হতে কয়েক কি. মি. দূরে রেইনহিল (Rainhill) নামক স্থানে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় এবং হাজার হাজার দর্শক প্রতিযোগিতা দেখতে ভিড় জমায়। শেষোক্ত ইঞ্জিনটি খুব তাড়াতাড়িই প্রতিযোগিতা হতে নাম প্রত্যাহার করে এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ ম্যানসপেরিল ভেঙে পড়ে এবং এটিতে তেল খরচ বেশি। নভেলটি যদিও হালকা এবং স্বচ্ছন্দ ইঞ্জিন ছিল তবুও ভেঙে যায়। ফলে বিচারকরা স্টিফেনসনের রকেটকেই 1829 সালের 8 অক্টোবর সর্বসম্মতভাবে শ্রেষ্ঠ বলে রায় দেন কারণ এটি প্রতিযোগিতার সমস্ত শর্তই সফলভাবে পালন করেছিল এবং স্টিফেনসন 500 পাউন্ডের পুরস্কারটি অর্জন করেন।

চূড়ান্ত পরীক্ষায় রকেট 38.62 কি. মি./ঘন্টা গতিবেগ অর্জন করে এবং 1829 সালের 8 অক্টোবর স্টিফেনসনের জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় মুহূর্ত। এভাবে বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিনের ধারণা দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে এবং রেলপথের নতুন যুগের সূচনা হয়। খুব অল্পসময়ের ভিতর গণমানুষের ভ্রমণের জন্য রেলপথ স্থাপন পরিকল্পনা সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আওতাধীন বর্তমান রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় 1.24 মিলিয়ন কি. মি. যা পৃথিবী হতে চন্দ্রের দূরত্বের চেয়ে তিনগুণেরও বেশি অথবা পৃথিবীর পরিধির চেয়ে 30 গুণেরও বেশি। অর্থাৎ কেউ যদি 1.61 কি. মি./ মিনিট গতিবেগে যাত্রা আরম্ভ করে তবে বিশ্বের রেলপথের সমস্ত দৈর্ঘ্য অতিক্রম করতে তার সময় লাগবে । বছর পাঁচ মাস (যে সমস্ত স্থানে দ্বৈত লাইন আছে সে হিসাব বাদে)।

তবে প্রথমদিকে অধিকাংশ লোকই রেলপথে ভ্রমণকে অনিরাপদ মনে করতো। এটা বিস্ময়কর যে, ইংল্যান্ডে রেলপথ স্থাপনের 17 বছর পর মন্ত্রীদের পরামর্শে রাণী ভিক্টোরিয়া রেলপথে ভ্রমণকে নিরাপদ মনে করেছিলেন। তিনি প্রথম 1842 সালের 13 জুন রেলপথে লন্ডন থেকে স্লাফে গিয়েছিলেন। জার্মানির এক ডাক্তার বলতেন যদি কোন ব্যক্তি চলন্ত ট্রেন দেখেও তবে সে পাগল হয়ে যাবে এবং ট্রেনে চড়ার বিজ্ঞাপনগুলো শুনে না ফেলা হয় তবে গরুর দুধ টক হয়ে যেতে পারে। ইন্ডিয়ার বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ R-C Dult ইন্ডিয়ার রেলপথ স্থাপনকে অপচয় বলে মনে করতেন।

আধুনিক রেলপথের সাথে স্টেশন প্লাটফরম, বগি, ওয়াগন, ভায়াডাক্ট (উপত্যকার উপর নির্মিত সেতু), সুড়ঙ্গ, কালভার্ট, ব্রিজ সিগন্যাল, সিগন্যাল কেবিন সেড, রেস্তোরা ইত্যাদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 1828 সালে ফ্রান্সে প্রথম রেলপথ স্থাপন করা হয় এবং চালিকাশক্তি ছিল ঘোড়া। যাত্রীবহন শুরু হয় 1832 সালে এবং বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ব্যবহার হয় 1844 সালে। 1833 সালে আমেরিকায় মোহাক এবং হাডসন এর মধ্যে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। আয়ারল্যান্ডে 1834 সালে রেলপথ স্থাপন করা হয় এবং ব্যবহার শুরু হয় একই সময়ে। জার্মানির প্রথম রেলপথ 1835 সালে নুরেমবার্গ থেকে পার্থ পর্যন্ত জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। নেদারল্যান্ডে আমস্টারডাম থেকে হারলেম এবং ইটালিতে নেপলস থেকে পোর্টাস পর্যন্ত রেলপথ প্রথম 1839 সালে ব্যবহার শুরু হয়। বেলজিয়ামে রেলপথের উদ্বোধন হয় 1835 সালের 5 মে, অস্ট্রিয়াতে 1838 সালে, যুগোশ্লাভিয়াতে 1846 সালে।

সুইজারল্যান্ড এবং ডেনমার্কে 1847 সালে, স্পেনে 1848 সালে নরওয়ে এবং আফ্রিকাতে 1854 সালে, সুইডেন 1856 সালে, জাপানে 1872 সালে, চীনে 1875 সালে, বার্মায় 1877 সালে এবং তুরস্কে 1888 সালে। ভারতবাসী লর্ড ডালহৌসীর নিকট রেল লাইনের জন্য ঋণী। তিনিই প্রথম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকের নিকট কলকাতা থেকে লাহোর, আগ্রা থেকে বোম্বে এবং বোম্বে হতে মাদ্রাজ পর্যন্ত রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং কোম্পানি তার প্রস্তাব মেনে নেয়। ইন্ডিয়াতে 1853 সালের 13 এপ্রিল বোম্বে থেকে থানা পর্যন্ত 33 কি. মি. পথ প্রথম রেলপথ হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়। প্রথম ট্রেনটি 21 বার তোপধ্বনির মাধ্যমে বেলা 3.30 মিনিটে বহু জনগণের উপস্থিতিতে যাত্রা শুরু করে এবং ঐদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। ট্রেনটি বেলা 4.45 ঘটিকায় থানাতে পৌছায়। অতিথিরা একই ট্রেনে চড়ে 17 এপ্রিল সন্ধ্যা টোয় বোম্বে প্রত্যাবর্তন করে।

১.২ রেলপথের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা (Mention the Characteristics of Railways):

পরিবহনের অন্যান্য মাধ্যমগুলোর যত সুবিধাই থাকুক না কেন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য রেলপথের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

(i) রেলপথই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কর্মভার সম্পাদন করে। এখানে অনেক লোকের চাকুরি সংস্থান হয় এবং তারা অনেক কর্ম সম্পাদন করে। বিশ্বের যেকোনো কোম্পানির চেয়ে রেল কোম্পানির স্থায়িত্ব অনেক বেশি।

(ii) বস্তুত সারাবিশ্বে রেলপথের বিস্তৃতি আছে।

(iii) অন্যান্য মাধ্যমের তুলনায় রেল ভ্রমণে খরচ কম হয়।

(iv) ওজনের তুলনায় রেল ইঞ্জিনের শক্তি খরচ কম।
(v) আধুনিক রেলের গতিও অনেক বেশি।
(vi) নিয়ন্ত্রিতভাবে চলাচল করার ফলে স্টিয়ারিং এর প্রয়োজন নেই।
(vii) শুধুমাত্র ট্রেনের মাধ্যমেই অতিদ্রুত এবং অধিক লোক নিরাপদে বড় শহরের মধ্য দিয়ে পরিবহন সম্ভব।
(viii) ট্রেন, বাস, কার অথবা বিমানের তুলনায় বেশি স্বস্তিতে বেশি মালামাল নিয়ে অধিক দূরত্বে ভ্রমণ করা যায়।

১.৩.১ রেলপথের সুবিধা (Describe the Advantages of Railway):

পরিবহনে রেলপথের সুবিধা অনেক, সুবিধাসমূহকে তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যায় এবং সেগুলো নিম্নরূপ:

(1) অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ (Economical Advantages)।
(2) রাজনৈতিক সুবিধাসমূহ (Political Advantages)
(3) সামাজিক সুবিধাসমূহ (Social Advantages)।

তিনটি ক্যাটাগরিকে নিম্নে সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ কর হলো:

(১)অর্থনৈতিক সুবিধাসমূহ (Economical Advantages):

(i) রেলপথের সুষ্ঠু ব্যবহারে অধিক লোক প্রয়োজন, ফলে অনেক লোকের চাকুরি ব্যবস্থা হবে।
(ii) ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পায় ফলে ঐ এলাকার জমির মূল্য বেড়ে যায়।
(iii) জনগণের মধ্যে গতিশীলতা আনে। ফলে শহরে লোকের মানসিক শান্তি অবসানে সহায়তা করে।
(iv) শ্রম এবং কাঁচামাল এর গতিশীলতার জন্য শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়।
(v) প্রাকৃতিক সম্পদ এবং কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ সহজেই স্থানান্তরিত করা যায় বলে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকে।
(vi) বন্যা বা দুর্ভিক্ষের মতো দুর্যোগের সময় সহজেই অতিদ্রুত খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা সম্ভব।

(২) রাজনৈতিক সুবিধাসমূহ (Political Advantages):

(i) কেন্দ্রীয় শাসন সহজেই পালন করা যায়।

(ii) জনগণের মধ্যে জাতীয়তার উন্মেষ ঘটায়।

(iii) একসাথে অধিক লোক স্থানান্তরিত হতে পারে।

(iv) যুদ্ধ বা দ্রুত প্রয়োজনের সময় সহজেই সৈন্যদল এবং যুদ্ধাস্ত্র স্থানান্তরিত করা যায়।

(v) বিভিন্ন ধর্মের বর্ণের লোকের মধ্যে একতা আনে।

(৩) সামাজিক সুবিধাসমূহ (Social Advantages):

(i) যেহেতু জনগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সহজেই যেতে পারে সে কারণে জনগণের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয় এবং নিজ দেশ নিয়ে গর্বিত হয়।

(ii) ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সহজেই যাতায়াত করতে পারে।

(iii) সহজ এবং নিরাপদ পরিবহনের নিশ্চয়তা দেয়।

(iv) রেলপথ সব থেকে নিরাপদ, সস্তা এবং আরামদায়ক ভ্রমণের নিশ্চয়তা দেয়।

১.৪ রেলওয়ে জরিপের উদ্দেশ্য
(Mention the Objectives of Railway Surveys):

সঠিক এবং সন্তোষজনক নতুন রুট স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের জরিপ করা হয়ে থাকে। জরিপের আসল কাজ শুরু করার পূর্বে ঐ এলাকার গ্রহণযোগ্য ম্যাপ তৈরি করতে হবে। এটা সঠিকভাবে এলাইনমেন্ট নির্ণয় করতে অফিসকে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন রকম জরিপ কাজ পরিচালনা করতে সাহায্য করে। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সার্ভে ম্যাপ অথবা এলাকার সার্ভে ম্যাপ ব্যবহার করা হয়। এই ম্যাপ দুটিতে ঐ স্থানের সমোন্নতি রেখা এবং এলাকার প্রয়োজনীয় স্থান বিবরণী দেওয়া থাকবে। সমেড়ুতি রেখা পথের ঢালের মাত্রা চিহ্নিত করতে সহায়ক হবে। নতুন রেললাইন স্থাপনে যে সমস্ত জরিপ করা হয় তা নিম্নরূপ:

(১) পর্যবেক্ষণ জরিপ (Reconnaissance Survey)
(২) প্রাথমিক জরিপ (Preliminary Survey)
(৩) স্থান জরিপ (Location Survey)
নিম্নে এগুলোর উদ্দেশ্যগুলো উদ্ধৃত করা হলো:

পর্যবেক্ষণ জরিপ (Reconnaissance Survey): রেললাইন বসানোর উদ্দেশ্যে পূর্বে যে অঞ্চলের জরিপ কাজ করা হয়নি, ঐ অঞ্চলের জন্য প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং জরিপের নামই পরিদর্শন জরিপ। এ জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য হলো– এ জরিপতব্য অঞ্চল সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান পাওয়া ও এনা জরিপতব্য অঞ্চলের প্রধান অঙ্গগুলো সম্পর্কে তথ্যাদি নেয়া।

প্রাথমিক জরিপ (Preliminary Survey):

দর্শন জরিপের উপর ভিত্তি করে মনোনীত বিভিন্ন পথসমূহের মধ্য হয় একটি পথকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণের নিমিতে প্রাথমিক জরিপ করা হয়। তাই এ জরিপ বেশ সূদ্ধতার সাথে করার জরিপের উমেপ্যাসমূহ হলো–

(i) পরিদর্শন জরিপের সুপারিশকৃত বিভিন্ন পথের মধ্য হতে সর্বাধিক উপযোগী ও সাশ্রয়ী পথ নির্বাচন করা।

(ii) সম্ভাব্য পক্ষসমূহের মথা হবে রেলপথের জন্য একটি পথ নির্বাচনের জন্য এগুলোর বিশদ সুদ্ধ পরমাপ, রব পর্যালোচনা, পরীক্ষা–নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা।

স্থান জরিপ (Location Survey):

ভূমিতে কোনো পথের অবস্থান চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করার জন্য অবস্থান জরিপ করা

(i) প্রাথমিক জরিপের প্রাপ্ত তথ্য হতে নির্বাচিত ও ভূমিতে স্থাপির সর্বাধিক উপযোগী ও সাশ্রয়ী পথটির বিস্তারিত জরিপ করা এবং পথটি নকশায় অবস্থান চিহ্নিত করা ও সরেজমিনে ভূমিতে সংস্থান করা।

নতুন রেলওয়ে লাইন স্থাপনের কারণ (Explain the Reasons for Laying a New Railway Line)

নিম্নোক্ত কারণে নতুন রেলওয়ে লাইন স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়ে থাকে এবং প্রস্তাবিত পথটির:

(ক) খরচের পরিমাণ (প্রজেক্ট সম্পাদনে খরচ, মেরামত খরচ, শূন্য বিবেচ্য খরচ ও কার্যকালীন অন্যান্য খরচ),

(খ) নিরাপত্তা (বিনা দুর্ঘটনায় যাত্রী ও জ্বালামাল পরিবহনের নিরাপত্তা), শ্যে দ্রুত যাতায়াত (সন্তোষজনক গতিতে ট্রেন চলাচল করা) এর বিষয় বিবেচনা করে সন্তোষজনক বিবেচা হলে পদটির প্রকল্প চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করা হয়। নতুন রেলওয়ে পাইন স্থাপনের কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(1) **কৌশলগত বিবেচনা (Strategic Consideration):** কখনো কখনো দুটি রেলপথকে একত্রীকরণ জরুরি হয়ে পড়ে, ধারে জরুরি প্রয়োজনে সৈন্যদেরকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা যায়।

(2) **ব্যবসা কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে (Linking of Trade Centres):** যদি দুটি ব্যবসা কেন্দ্রের মধ্যে রেল যোগাযোগ না ঘরে, এই পরিস্থিতিতে দুটি ব্যবাবা কেন্দ্রের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য রেললাইন স্থাপন করা যেতে পারে।

(3)**পোর্টের সাথে অভ্যন্তরীণ সংযোগ স্থাপন:** অনেক সময় দেশের অভ্যন্তরভাগের সাথে বন্দরের সংযোগ বা যোগাযোগ থাকে না। এয়ণ ক্ষেত্রে উক্ত বন্দরের সাথে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা কেন্দ্রগুলোকে সংযোগ করার জন্য নতুন রেলপথে যশ করা যেতে পারে।

(4)বর্তমান পথকে সংক্ষিপ্ত করা: একটি রাস্তা বর্তমানে দুটি বিন্দু A ও B অবস্থানে আছে। কিন্তু এই লম্বা রাস্তাকে নতুন রেলওয়ে পাইন স্থাপনের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।

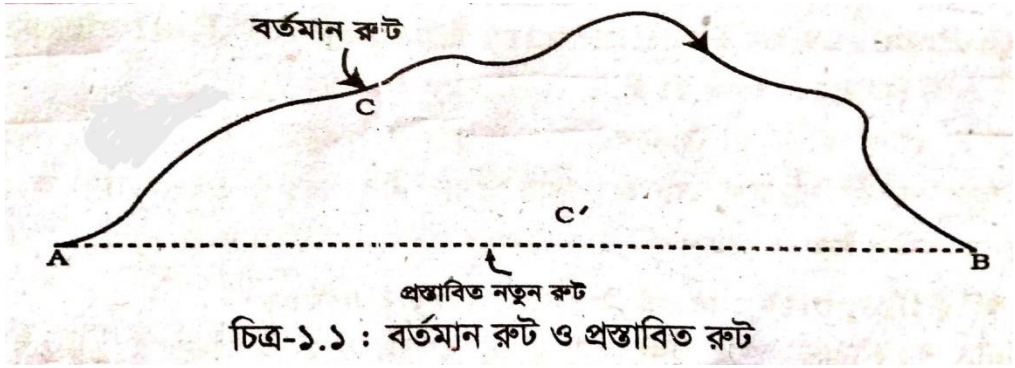

চিত্র-১.১ : বর্তমান রুট ও প্রস্তাবিত রুট

ACH এর ACH কটি সহজেই স্থাপিত হতে পারে এবং এক্ষেত্রে রাস্তার দৈর্ঘ্য কমে যাবে এবং এই পক্ষের

(5) শাখা লাইন স্থাপনে। রামার এয়ার লাইনের সাথে কখনো কখনো কোনো শহরের উন্নয়নকল্পে শাখা লাইন স্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে, সেক্ষেত্রে শাখা লাইন মেইন লাইনের ফিভার লাইন হিসেবে কাজ করে। শাখা বাইন এখন শহীদ AIB পুরাতন লাইন এবং CD প্রস্তাবর শাখা পাইন যা নতুন শহর D এর সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশে রোশখের ভবিষ্যত (Describe the Future of Railways in Bangladesh):

আমাদের দেশে এলপথের প্রচলন অনেক প্রাচীন হালও তা তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। বর্তমান সময়ে রেলপথকে জর্নালয় করতে জোংবিছাপ অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রেলওয়েতে অনলাইন টিকিট সেবা প্রদান করছে এবং পুরোনো বগি ও রাউন বেথামত করছে এবং বেলপথতে সম্প্রাসারিত করছে, ফলে এতে যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। রেলওয়ে বর্তমানে গার্থীদের যাতায়াতে সুবিধার জন্য নতুন লোকোমেটিক ট্রেন চালু করেছে এবং নতুন নতুন রুটে ট্রেন চালু করেছে। তাই বলা ধায় অদুর ভবিষ্যতে রেলপথ একটি জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যমে হবে।

সাধারণত বেলগম, জলপথ, আকাশপথ এবং সড়কপথই যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পশ্চিমে অনেকেই মনে করছে যে, নিকট ভবিষ্যতে রেলপথ তার গুরুত্ব হারাতে চলছে এবং যোগাযোগের অন্য মাধ্যমগুলো রেলপথের স্থান দখল করবে। মূলত নিম্নলিখিত দুটি কারণে এ রকম ভাবনার উদয় হয়।রেলপথের কিছু পদ্ধতি আধুনিকতার অন্তরায় যেমন লেভেল ক্রসিং সড়ক যোগাযোগ বাধা সৃষ্টি করে। পরিবহনের মাধ্যমগুলোর মধ্যে বেল অতি প্রাচীন। ফলে এর অবসর নেওয়ার সময় এসেছে নতুন মাধ্যমকে সুযোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে। নিম্নে এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও সমাধানের উপায় দেওয়া হলো যার মাধ্যমে সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশ রেলওয়ে ভবিষ্যতে উন্নয়নের সোপান তৈরি করতে পারে এবং স্বীয় গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে।

(১) যাত্রীদের সুযোগ সুবিধা (Passenger's facility): বাংলাদেশের রেল যাত্রীগণ যাতায়াত কালে ন্যূনতম সুযোগ। হতেও বঞ্চিত এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে মানবিক সুবিধা হতেও বঞ্চিত হয়। যেমন ট্রেনের অভ্যন্তরে ভাঙ্গা সিট। সিটে নোংরা আবর্জনা, টয়লেটে পানির অভাব ও অপরিচ্ছন্ন টয়লেট, স্টেশনে বিশ্রামাগারের অভাব, অপরিষ্কার দুর্গন্ধে ভরপুর স্টেশন ইত্যাদি যাত্রীদের রেলপথে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আনীহা সৃষ্টি করে। তাই যাত্রীদেরকে রেলপথে ভ্রমণে আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে ভবিষ্যতে রেলওয়ের সম্প্রসারণ ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে।

(২) দক্ষ প্রশাসন (Skilled administration):

বাংলাদেশ রেলওয়ে এর প্রশাসন ব্যবস্থার দক্ষতা প্রশ্নের সম্মুখীন। সঠিক ও যথার্থ পরিকল্পনার মাধ্যমে রেলওয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনের ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের অভাব, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি, সঠিক নিয়মে লোকবল নিয়োগ না করা, প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি কারণে দক্ষ প্রশাসন গড়ে উঠে নি। এ অবস্থায় সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে সর্বাধিক সুবিধা প্রদান প্রশাসনের সকল স্তরে সৎ, দক্ষ ও যোগ্য লোকবল নিয়োগ করে দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে রেলওয়ের হারানো গৌরব ভবিষ্যতে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

(৩) রেল পথের মান (Quality of the rallway line):

সেকেলে রেলট্রেক, সংকেত পদ্ধতি, স্লিপারের অভাব, পাথরের অপর্যাপ্ত, ইঞ্জিন ও বগির অভাব, ওয়াগনের অভাব, নিজস্ব টেলিযোগাযোগ না থাকা ইত্যাদি কারণে দেশের বৃহত্তর যোগাযোগ ব্যবস্থাটি দিন দিন রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে পড়েছে এমতাবস্থায় এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক অন্যথায় এর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে।

(৪) সুষ্ঠু পরিকল্পনা (proper planning):

বাংলাদেশ রেলওয়ে এর রেলপথ নির্মাণ, সম্প্রসারণ, যন্ত্রপাতি ও ইঞ্জিন নির্মাণ, যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ন, মেরামত, নতুন বগি আমদানি, লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তেমন কোন সুসঙ্গত সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। ফলে দেশের এ বৃহৎ সংস্থাটি একটি লোকসানি সংস্থায় পরিণত হয়েছে। এমতাবস্থায় এ সংস্থাটিকে ভবিষ্যতে টিকিয়ে রাখার জন্য এর সংস্কার, সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

(৫) অর্থনৈতিক দিক (Economical Aspects):

রেলওয়ে জাতির একটি বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান। এর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও সংস্কারের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বিনিয়োগ সম্ভব না হওয়ায় এ সংস্থাটি দিন দিন ধ্বংসের দিকে ধাবিত। তাই এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত বাজেট প্রদান করা আবশ্যক। অন্যথায় বাংলাদেশ রেলওয়ে ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের পরিবর্তে সংকোচিত হতে বাধ্য।

(৬) সামাজিক পদক্ষেপ (Social Step):

বিনা টিকেটে ভ্রমণ, রেলওয়ের মালামাল চুরি, জমিজমা, সম্পত্তি বেদখল ইত্যাদি কারণেও রেলওয়ে বিস্তর পরিমাণ আয় হতে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে আইনের যথাযথ প্রয়োগ জনগণের নৈতিক মান উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে রেলওয়ের ভবিষ্যৎ সন্তোষজনক পর্যায়ে নেয়া যেতে পারে।

(৭) অন্যান্য (Others):

রেলপথে ভিড়, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বর্তমান নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এ অবস্থা হতে উত্তোরণের জন্য। ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি, ট্রেনের আধুনিকায়ন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে টিকেট সংগ্রহ করার পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে বাংলাদেশ। রেলওয়েকে ভবিষ্যতে একটি উত্তম গ্রহণীয় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্থায়ী সড়ক

স্থায়ী সড়ক বা পারমানেন্ট ওয়ে (Define Permanent Way):

যে রেলসড়ক নির্মাণের পর তার উপর দিয়ে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ট্রেন চলাচল করে তাকে স্থায়ী বেলসড়ক বলে। অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে ট্রেন চলাচল করার উপযোগী লাইনকে স্থায়ী সড়ক বা পারমানেন্ট ওয়ে বলে। তার উপকরণ হলো রেল স্লিপার, ব্যালাস্ট ও বিভিন্ন সংযোগ উপকরণ। মাটির বাঁধের উপর প্রয়োজনীয় পাথর ফেলে সেই পাথরের টুকরার উপর আড়াআড়িভাবে স্লিপার স্থাপন করা হয় এবং স্লিপারের উপর দুটি রেলকে সমান্তরালভাবে স্থাপন করে বিভিন্ন সংযোগ উপকরণের দ্বারা রেলকে স্লিপারের সঙ্গে সংযুক্ত করে স্থায়ী রেলসড়ক তৈরি করা হয়। নিম্নে একটি স্থায়ী সড়কের প্রস্থচ্ছেদ দেখানো হলো:

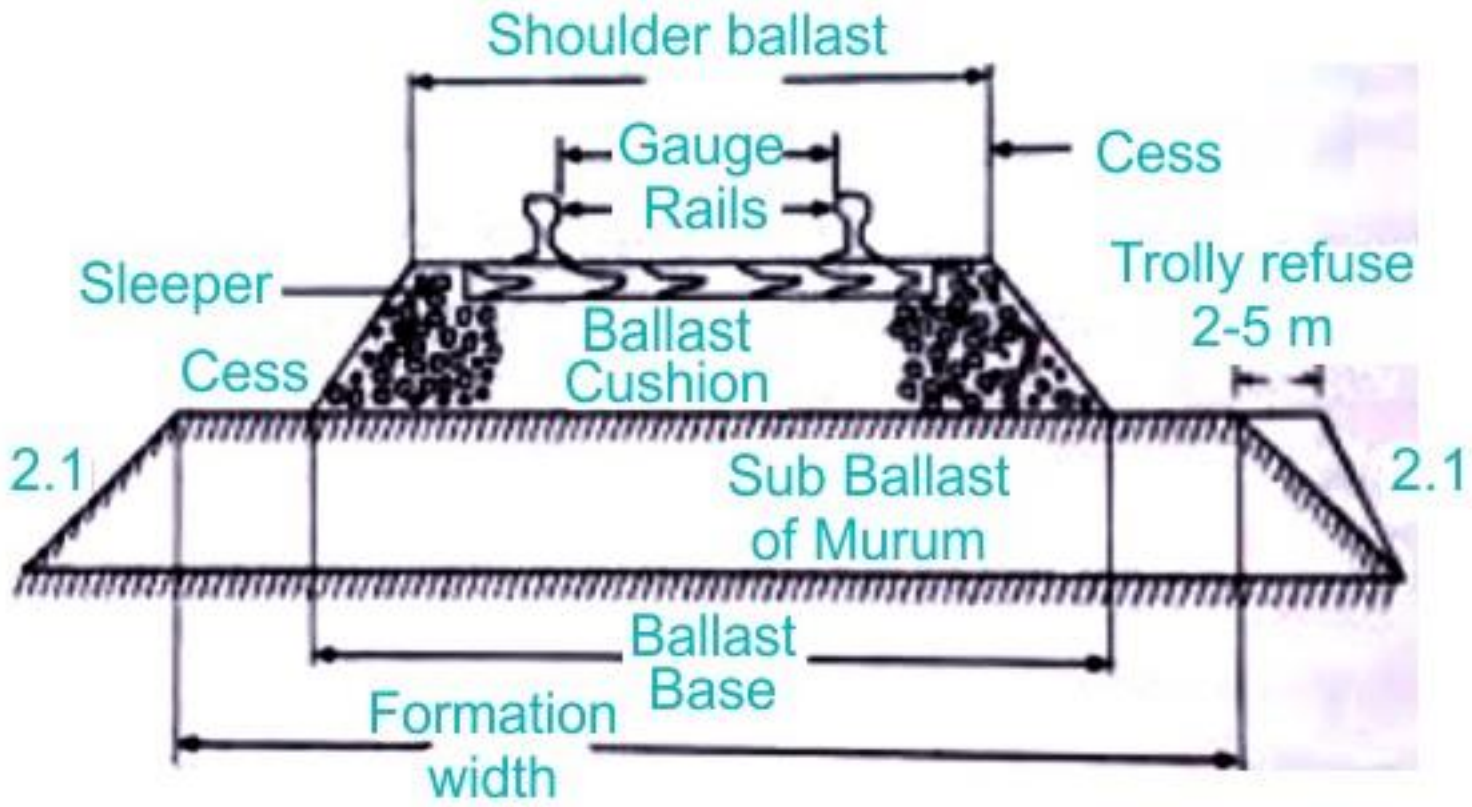

চিত্র: স্থায়ী সড়কের প্রস্থচ্ছেদ

২.১ স্থায়ী সড়কের আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য (State the Requirements of Permanent Way):

স্থায়ী সড়কের বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি নিম্নে বর্ণিত হলো–

(i) স্থায়ী রেলসড়ক এমন অনড়ভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে কোনো অবস্থাতে গেজ মাপের কোনো পরিবর্তন না ঘটে।

(ii) শুধু বাঁকের উপর ব্যতীত অন্য সকল জায়গায় রেল দুটি একই সমতলে থাকবে। তা না হলে ট্রেন চলাকালীন সময়ে অনর্থক দোল খাবে এবং ট্রেনের নিচের অংশের স্প্রিং বিয়ারিং ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(iii) যেসব জায়গায় ঢালের প্রয়োজন সেসব জায়গায় সমভাবে প্রয়োজনীয় ঢাল দিতে হবে। তা না হলে গাড়ির গতিবেগ 'বাড়বে এবং কমবে ফলে এতে ট্রেন চলাচলের অসুবিধা হবে এবং ট্রেনের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

(iv) স্থায়ী রেলসড়ক কিছুটা সংকোচন-প্রসারণ গুণসম্পন্ন হতে হবে যাতে রেল এবং চাকার ভিতরের উৎপন্ন আঘাতকে সহনীয় করে নিতে পারে। তা না হলে ট্রেন বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(v) উপর হতে আগত চাপে যাতে দুই স্লিপারের মধ্যবর্তী অংশ দেবে না যায় সে পরিমাণ শক্তিশালী হতে হবে।

(vi) নিখুঁত ড্রেনেজ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(vii) রেল এবং চাকার মধ্যে ঘর্ষণ গতির জন্য যতটা প্রয়োজন তার অধিক হবে না।

(viii) রেলসড়ক এমনভাবে তৈরি হবে যাতে সড়কের কোনো অংশে মেরামত নতুনভাবে স্থাপন করতে কোনো অসুবিধা না হয়।

(ix) রেলের উপর আগত ওজন চাকা এবং রেলের স্পর্শবিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হবে। এই ওজনকে সড়কের সকল জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে কোনো অংশে অহেতুক বেশি ভার না আসে এবং সে অংশ দেবে না যায়।

(x) রেলের চলন প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(xi) রেল সড়কের জয়েন্ট সুন্দর ও মজবুত হতে হবে।

(xii) আড়চ্ছেদে রেল এত উঁচু হবে না যাতে উপরের চাপে রেলের মাথা দুটি বাইরের দিকে হেলে যাবে।

(xiii) বাঁকে এর ডিজাইনে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

(xiv) ট্রেন চলাচলের জন্য রেলসড়কের এলাইনমেন্ট ফ্রি বা মুক্ত থাকতে হবে।

(xv) যেখানে পাশাপাশি একাধিক লাইন থাকবে সেখানে লাইনের মধ্যে এমন দূরত্ব দিতে হবে যে, দুটি গাড়ি একই লাইনে একই সময়ে একই জায়গায় আসলে কোনো ধাক্কা না খায়।

(xvi) একটি উত্তম রেলসড়কে প্রয়োজনীয় স্থানে উত্তম বাঁক থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সুপার এলিভেশন থাকবে।

২.২ রেল, রেলগেজ এবং দ্বৈত গেজের বর্ণনা [Describe Rail, Rail Gauge and Dual Gauge):

বেল (Rail) ছিল হচ্ছে সোমার পাটি। রেলসড়কের যে কাঠামোর উপর দিয়ে ট্রেনের চাকা চলাচল করে সে কথঠামোকে বেল বলে। বেলকে উত্তমরূপে স্লিপারের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়ে থাকে। রেলগেজ (Rail Gauge): বেলসড়ক তৈরি করার সময় যে দুটি রেল সমান্তরালভাবে পেতে রেলসড়ক তৈরি করা হয় সে বেল দুটি একটির ভিতরের ধার থেকে অপরটির ভিতরের ধার পর্যন্ত মধ্যবর্তী দূরত্বকে রেলগেজ বলে।

গেজ সাধারণত চার প্রকার:

(i) ব্রড গেজ Broad gauge) 1524 মি.মি. হতে 1676 মি.মি। খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, পার্বতীপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে ব্রডগেজ চালু আছে।

(ii) স্টান্ডার্ড পেজ (Standard gauge) 1435 মি. বি. হতে 1451 মিমি। বাংলাদেশের কোথাও চলু নেই।

(iii) মিটার গেজ (Meter pauge) 1000 মি.মি হতে 1067 মি.মি.। ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, সিলেট, বগুড়া, রংপুর নোয়াখালী, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে এই গেজ চালু আছে।

(iv) ন্যারো গেজ (Narrow gauge) 610 মিমি, হতে 762 মি.মি.। বাংলাদেশের কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান (কুষ্টিয়ার মোহিন মিলস ও ঢাকা শিশু পার্ক) ছাড়া অন্য কোথাও চালু নেই।

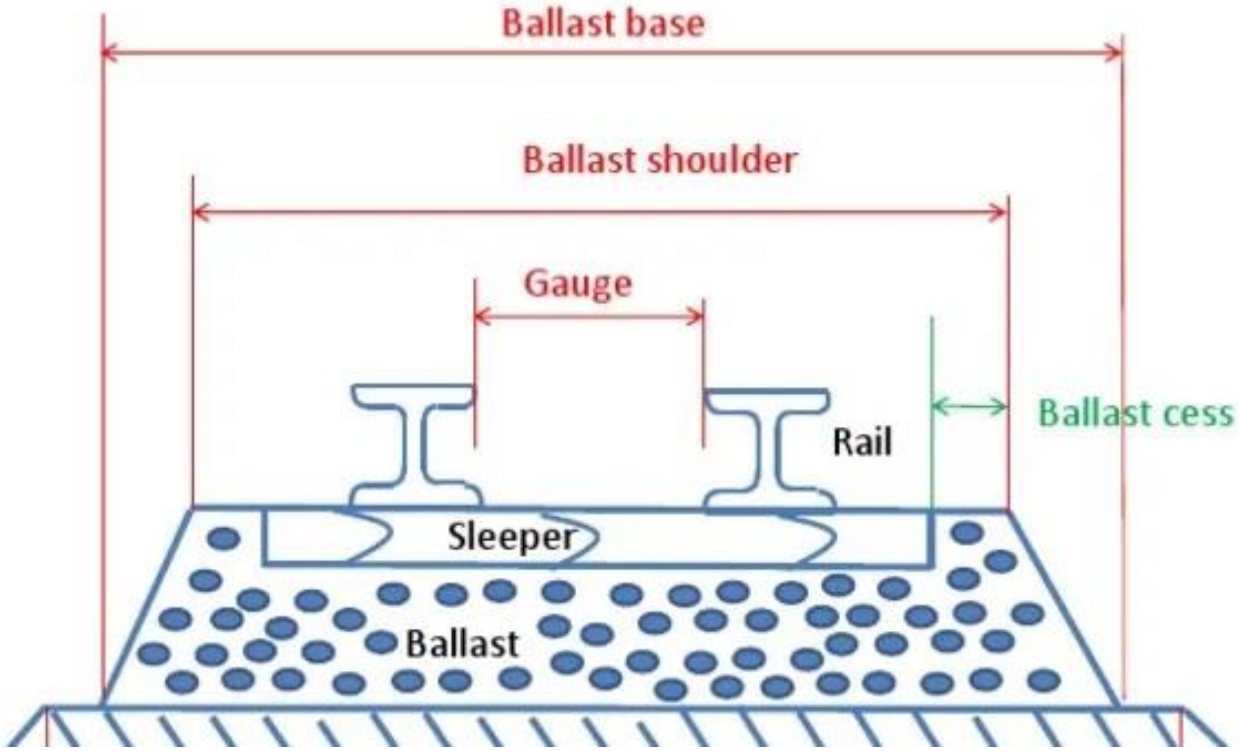
Ballast base
Ballast shoulder
Gauge
Rail
Ballast cess
Sleeper
Ballast

চিত্র: রেলগেজ

গেজ মাপ নির্ধারণে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়–

(i) যানবাহনের প্রকৃতি (Traffic Condition)
(ii) স্থায়ী বৃত্তান্ত (Topograhy of the area)
(iii) যুদ্ধকালীন উপযোগী (strategic needs)
(iv) খরচ (cost)।

(1) যানবাহনের প্রকৃতি (Traffic Condition): যে সমস্ত এলাকায় ট্রেনের সংখ্যা বেশি ও ভারি এবং উচ্চগতিসম্প যানবাহন চলাচল করবে। সেখানে ব্রডগেজ (Broad gauge) ও স্ট্যান্ডার্ড গেজ ব্যবহৃত হবে। যেখানে ট্রেনের সংখ্যা কম ও হালকা ওজনের এবং নিম্নগতি সম্পন্ন ট্রেন চলাচল করবে। সেখানে ন্যারো গেজ ব্যবহৃত হয়। মধ্যম মানের সড়কে মিটার গেজ।

(ii) স্থায়ী বৃত্তান্ত (Topography of the Area):

দেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপরও গেজ মাপ অনেকটা নির্ভর করে। সমতল এলাকাতে লোকসংখ্যা ও মালামালের পরিমাণ বেশি সেখানে ব্রডগেজ, স্ট্যান্ডার্ড গেজ, মিটার গেজ ব্যবহৃত হয়। পাহাড়ি এলাকায় ন্যারো ও লাইট গেজ ব্যবহার করা উচিত।

(iii) যুদ্ধকালীন উপযোগী (Strategic Need):

দেশের জাতীয় নিরাপত্তার দিকে বিবেচনা করেও গেজ মাপ বিবেচনা পারে। করা উচিত যাতে সামরিক বাহিনী দ্রুত একস্থান থেকে অন্যস্থানে দ্রুত যাতায়াত করতে

(iv) খরচ (Cost):

রেলওয়ে প্রজেক্টের জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন তবে অন্যান্য গেজ মাপ অপেক্ষা ব্রডগেজ অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন।

দ্বৈত গেজ (Duat Gauge): দ্বৈত গেজ (Dual Gauge) একটি রেলওয়ে পথ যাতে একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন ট্র্যাক গেজ ট্রেন চলাচল করতে পারে। একে কখনো কখনো মিশ্র গেজ ট্র্যাকও বলা হয়। একটি দ্বৈত গেজ রেলপথে তিনটি ভিন্ন পাত বা ট্র্যাক থাকে। এক পাশে একটি পাত বা ট্র্যাক সাধারণ বা কমন থাকে এবং অপর পাশে দুটি বা এক জোড়া বিশেষ পাত বা ট্র্যাক ব্যাংকে। বিশেষ পাত বা ট্র্যাক দুটো কাজাগছি থাকে এবং সাধারণ বা কমন পাত বা ট্র্যাকটি একটু দূরে থাকে। যখন এই রেলপামে উপর ট্রেন বা রেলগাড়ি চলাচল করে তখন ট্রেন অনুসারে সাধারণত পাত বা ট্র্যাক এবং অন্য একটি পাত বা ট্র্যাক ব্যবহার করে। দ্বৈত গেজ রেলপথে কখনো কখনো চারটি পাত বা ট্র্যাক ব্যবহার করা হয়। দুটো বইরের পাত বা ট্র্যাক এবং দুটো অভ্যান্তরীল পাত বা ট্র্যাক। নিচে দ্বৈত গেজ রেলপথে চিত্র দেওয়া হলো–

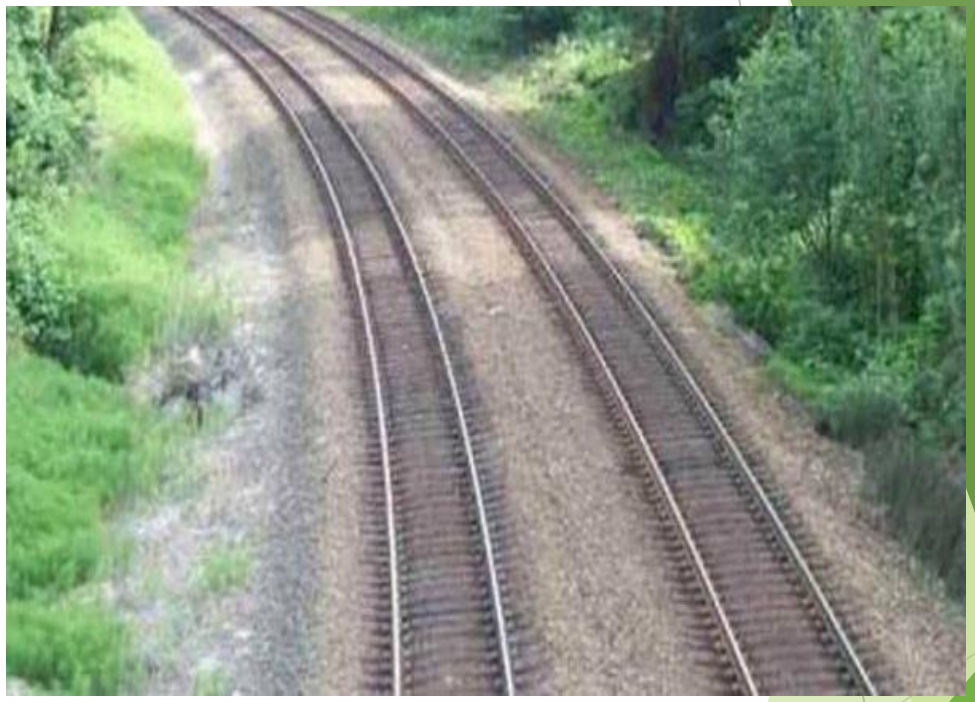

২.৩ আদর্শ রেলের সরকারি বিষয়াদি (Mention the Requirements of An Ideal Rail):

রেলের কাজ নিম্নরূপ–

(i) ট্রেনের চাকা চলাচল করার জন্য শক্ত, মসৃণ, সমতল ও পরিবর্তনশীল এল ধারণ করা।

(ii) হেলের মাধ্যমে উপর হয়ে আগত ওজন স্লিপার, ব্যালাস্ট ও ফরমেশন লেভেলে স্থানান্তরিত করে।

(iii) রেলের উপর খাড়া লোড, লম্বালম্বি লোড এবং ব্রেকিং ফোর্সের জন্য যে স্ট্রেস উৎপন্ন হয় তা নিরাপদে বহন করে।

একটি আদর্শ রেসের দরকারি বিষয়াদি বৈশিষ্ট্য (Requirements of an Ideal Rail):

আদর্শ রেলের দরকারি বিষয়াদি বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ–

(i) এটা পর্যাপ্ত স্টিফনেস (অনমনীয়তা) অধিকারী হবে।

(ii) রেলের ভরকেন্দ্র যথাসম্ভব রেলের উচ্চতার মধ্যবর্তী স্থানে হতে হবে।

(iii) ফ্ল্যাঙ্কের আকার এমন হবে, যাতে সহজেই ফিসপ্লেট লাগানো যায়।

(iv) রেলের আকার দেখতে মানানসই হবে।

(V) রেলের উল্লম্ব ক্ষয়ের জন্য হেডের গভীরতা পর্যাপ্ত পরিমাণ হবে।

(Vi) রেলের হেডওয়েব এবং ফুটে মেটালের পরিমাণ সঠিক এবং সুষম হতে হবে।

(Vii) এর পৃষ্ঠদেশ এবং গেজ প্রান্ত শক্ত ও ক্ষয় প্রতিরোধে সক্ষম হতে হবে।

(Viii) রেলের ওয়েবের দূরত্ব এমন হবে। যেন এটি পর্যাপ্ত লোড বহন করতে পারে

(iX) রেলের Foot এর গ্রন্থ এমন হতে হবে যে, গাড়ি হতে যে ওজন রেলের উপর আসে তা স্লিপারের বড় অংশের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে।

(x) বেল এবং ঢাকার স্পর্শজনিত এলাকা এমন হতে হবে যা স্পর্শজনিত পীড়ন এর পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

(xi) রেলে হেড (Head), ওয়েব (Wab) এবং ফুট (Foot) এ তিনটি অংশ থাকবে।

(xii) উপরিতল অবশ্যই সমান ও মসৃন হবে।

(xiii)তুলনামূলকভাবে সস্তা হতে হবে।

(xiv) রেলের প্রস্থচ্ছেদ উপযোগী আকারের হতে হবে।

২.৩.১ রেলের প্রকারভেদ (Mention Different Types of Rail):

রেলের প্রকারভেদসমূহ নিম্নরূপ–
রেল প্রধানত তিন প্রকার

(১) ডবল মাথা রেল (Double Headed Rail)
(২) বুল মাথা রেল (Bull Headed Rail)
(৩) চেপ্টা তলা রেল (Flat Footed Rail)

(১) ডবল মাথা রেল (Double Headed Rail): এ ধরনের রেলের নিচের মাথা এবং উপরের মাথা একই প্রস্থচ্ছেদের) প্রথম অবস্থায় রেলওয়ে প্রকৌশলীগণ মনে করেন যে, যদি দুই সমান মাথা বিশিষ্ট য়েল তৈরি করা হয়, তবে উপরের অংশ যখন অধিক যানবাহন চলাচালের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তখন নিচের মাথাকে উল্টিয়ে কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু তাদের প্রস্তাব অনুযায়ী রেল তৈরি করার পর দেখা গেল যে। উপরের অংশ যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিচের আশের এর চেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই জাতীয় রেলকে স্লিপারের সঙ্গে আটকাবার জন্য তেল চেয়ারের দরকার হয়। ৩২ ধরনের বেশ রট আয়রনের তৈরি, এর দৈর্ঘ্য 6.10 মিটার হতে 7.32 মিটার হ 49.০০ কেজি/মি হয়। বর্তমানে এই রেলের ব্যবহার খুবই কম।

(২) বুল মাথা রেল (Ball Headed Rail): এ ধরনের রেলের উপরের মাথার তুলনায় নিচে মাথা কম হস্থের হয়। এ ধরনের মেলকে সরাসরিভাবে স্লিপারের উপর স্থাপন না করে চেয়ারের মাধ্যম স্লিপারের সাথে যুক্ত করা হja রেলের ওজন ১০ কেজি/মি, থেকে 50 কেজি/মি, পর্যন্ত হয় এবং প্রতি রেলের দৈর্ঘ্য সাধারণত 18.20 মিটার।

(৩) চেপ্টা তলা রেল (Flat Footed Rail):

এ রেলটি বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত রেল। বিশ্বের প্রায় 90% রেলসড়কই এ রেল এর ব্যবহার দেখা যায়। এ ধরনের রেলের উপরের মাথার তুলনায় নিচের মাথা অধিক প্রস্থবিশিষ্ট হয়। এ ধরনের রেলকে সরাসরিভাবে স্লিপারের উপর স্থাপন করা হয়। ব্রিটিশ রেলওয়েতে এই রেলের ওজন 54 কেজি/মি. এবং 49 কেজি/মি.। অন্যান্য দেশে স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়।

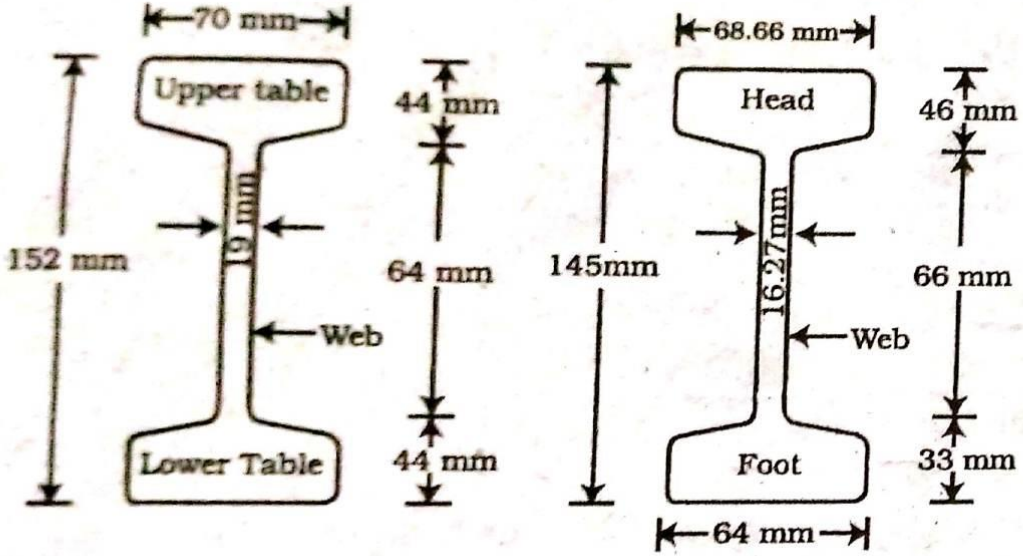

চিত্র- ২.৪ : Double Headed

চিত্র- ২.৫ : Bull Headed Rail

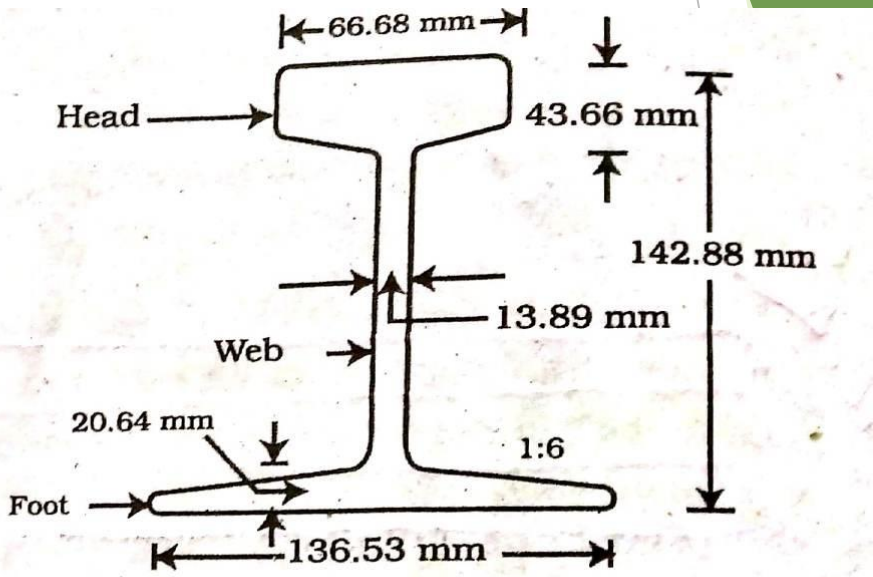

চিত্র- ২.৬ : Flat Footed Rail

রেল ব্যর্থ হওয়ার কারণ (Mention the Causes of Failure of Rails): নিম্নলিখিত কারণে রেল ব্যর্থ হয়-

(i) প্রয়োজনীয় উপাদানে বেল তৈরি করা না হলে।

(ii) রেল তৈরির সময় ত্রুটি মুক্ত না হলে।

(iii) এক স্লিপার হতে অপর স্লিপার স্থাপনের দূরত্ব বেশি হলে।

(iv) প্রয়োজনীয় সংকোচন এবং সম্প্রসারণের ব্যবস্থা না থাকলে।

(v) ট্রেনের চাকা আটকে গেলে।

(vi) প্রয়োজনের তুলনায় কম ওজনের রেল ব্যবহার করা হলে।

(vii) অনেকদিন ব্যবহারের ফলে রেলের উপরের অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে।
(viii) সঞ্চালিত Axle load (ধুরাবাহিত ওজন) অধিক হওয়ার জন্য।
(ix) বারবার রেল মেরামতের জন্য।
(x) রেলের উপাদান খারাপ হওয়ার জন্য।
(xi) বেলগাড়ির লাইন ছাতির কারণে।
(xii) রেলগাড়ির গতিবেগ অধিক হওয়ার কারণে।
(xiii)সঠিকভাবে রেলে ওয়েল্ডিং না করার কারণে।
(xvi) যথার্থ দৈর্ঘ্যের রেল ব্যবহার না করার কারণে।
(xv) শিয়ারিং পীড়নের জন্য।

রেল ব্যর্থতার প্রকারভেদ (Types of Rail Failure):

রেলের ব্যর্থতাসমূহ নিম্নলিখিত পাঁচভাবে সংঘটিত হয়। যথা-

(1) মাথা ভেঙে (Crushed Head)।
(2) তির্যক ফাটল বা গর্ত হয়ে (Transverse Fissure or Hole) ।
(3) মাথা চিরে যাওয়া (Split Head)।
(4) অনুভূমিক ফাটল (Horizontal Fissure)
(5) বর্গাকার বা কৌণিকভাবে ভেঙে যাওয়া (Square or Angular Breaks)।

(1)মাথা ভেঙে (Crushed Head):

রেল তৈরির সময়ে ত্রুটি, রেলের চাকা হঠাৎ থেমে যাওয়ায়, রেলের চাকা পিছলিয়ে যাওয়ায় এবং রেলের প্রান্তে দুর্বল সাপোর্টের জন্য রেলের মাথা ভেঙে যায়।

(2) **তির্যক ফাটল বা গর্ত (Transverse Fissure or Hole):** এই প্রকার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে রেলের মাথায় তির্যক ফাটল দেখা দেয় এবং এই ফাটল কটূরের মতো বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই ফাটল দেখতে মসৃণ ডিম্বাকার অথবা গোলাকার। রেল তৈরির সময় ত্রুটি এবং অতিরিক্ত গাড়ি চলাচলের জন্য রেল এভাবে ব্যর্থ হয়।

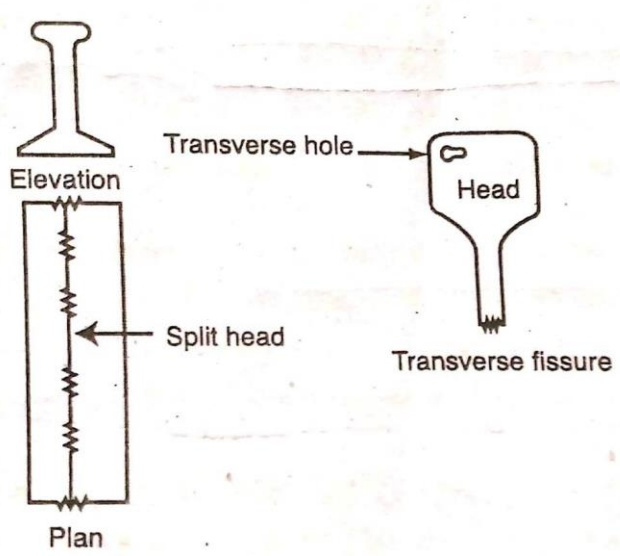

চিত্র- ২.১২ : স্পিলিট হেড

চিত্র- ২.১৩ : তির্যক ফাটল

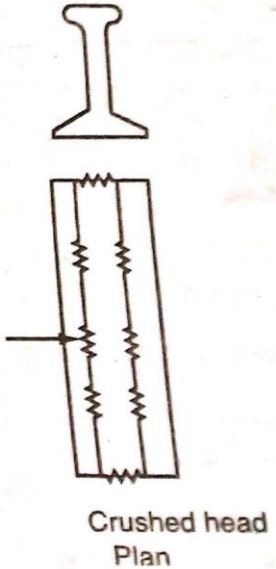

চিত্র- ২.১৪ : ক্রাশড হেড

(3)মাথা চিরে যাওয়া (Split Head): এই প্রকার ব্যর্থতায় বেলের মাথা চিরে যায়। এই ঘটনা সাধারণত বেল তৈরির। সময় ত্রুটির কারণে হয়ে থাকে।

(4) অনুভূমিক ফাটল (Horizontal Fissure): এই প্রকার ব্যর্থতায় অনুভূমিকভাবে প্রথমে অল্প ফাটল দেখা যায় এবং পরে আস্তে আস্তে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত ফিসপ্লেট ব্যবহার করলে অথবা অল্প পরিমাণ ব্যালাস্ট দ্বারা জয়েন্টে স্লিপারের নিচে প্যাকিং করলে এই ধরনের ফাটলের সৃষ্টি হয়।

(5) বর্গাকার বা কৌণিকভাবে ভেঙে যাওয়া (Square or Angular Breaks): এই প্রকার ব্যর্থতায় রেল ভাটিক্যাল অথবা তির্যকভাবে ভেঙে যায়।

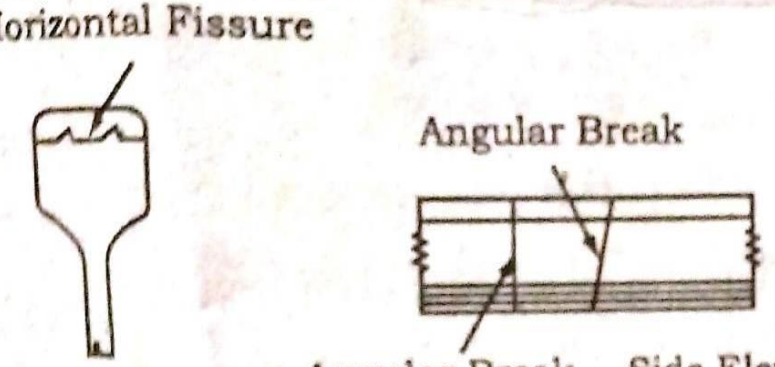

চিত্র- ২.১৫ : অনুভূমিক ফাটল

চিত্র- ২.১৬ : বর্গাকার বা কৌণিকভাবে ভেঙে যাওয়া

বাকলিং এবং বাকলিং এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Mention the Precautions To Be Taken to Prevent Buckling of Rail):

বাকলিং (Buckling): মাঝে মাঝে রেল অবস্থান থেকে সরে গিয়ে বাঁকের সৃষ্টি করে। রেলের সাধারণ সম্প্রসারণে বাধাপ্রাপ্ত হলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। একে রেলের বাকলিং বলে। রেল লাইনের ক্ষেত্রে বাকলিং খুবই মারাত্মক ত্রুটি। এর ফলে গাড়ি লাইনচ্যুত হয়। কারণ (Causes): নিম্নের দুটি কারণে রেলে বাকলিং হয়ে থাকে।

(1)প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্প্রসারণ ফাঁক

(2)জয়েন্ট অতিরিক্ত শক্ত হলে।

বাকলিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Prevent of Buckling)

রেল লাইনে বাকলিং খুবই মারাত্মক, এর ফলে গাড়ি লাইনচ্যুত হয়। বাকলিং প্রতিরোধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(i) রেলের জয়েন্টে পর্যাপ্ত প্রসারণ ফাঁক (গ্যাপ) থাকতে হবে।
(ii) এন্টি ক্রীপ ফ্যাসেনিং প্রয়োগ করতে হবে।
(iii) ওয়েলডেড রেলের সংখ্যা বেশি হতে পারবে না।
(iv) নির্দিষ্ট সময় পর পর রেল ও ফিসপ্লেটের সংযোগস্থলে পিচ্ছিলকারী পদার্থ প্রয়োগ করতে হবে।
(v) স্লিপারের ঘনত্ব রেল সেকশন এবং ব্যালাস্টের পরিমাণ পুনরায় ডিজাইন করতে হবে।
(vi) রেলের ফিস বোল্টগুলো খুব শক্তভাবে আটকানো যাবে না যাতে রেলের সংকোচন ও প্রসারণে বাধার সৃষ্টি হয়।
(vii) ক্রীপের মাত্রা কমানোর জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়
রেল সংযোজক ধারণা

৩.১ রেল ফ্যাসেনিং বা রেল সংযোজক (State the Meaning of Rail Fastening):

রেলকে স্লিপারের সঙ্গে আটকাবার জন্য যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় সেগুলোতে রেল ফ্যাসেনিং বলো। ফ্যাসেলি হিসেবে নিম্নলিখিত উপকরণসমূহ ব্যবহৃত হয়। যথা–

(1) ফিসপ্লেট।
(2) স্পাইক, ফ্যাং বোল্ট এবং হক বোল্ট।
(3) চেয়ার এবং খিল।
(4) বিয়ারিং প্লেট।

৩.২ আদর্শ রেল ফ্যাসেনিং এর বৈশিষ্ট্য (Mention the Requirements of an Ideal Rail Fastening):

তেল ফ্যাসেনিং এর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়–

(1) এটা দামে সস্তা ও টেকসই হবে।

(ii) এটা সহজেই সংস্থাপন করা যায়।

(iii) আঘাত এবং কম্পন প্রতিরোধে সক্ষম হবে।

(iv) বৈদ্যুতিক সেকশনে বিদ্যুৎ কুপরিবাহী হিসেবে কাজ করা।

(v) ক্রীপ প্রতিরোধী গুণসম্পন্ন হবে।

(vi) লাইন স্থাপনের সময় এবং রক্ষণাবেক্ষণকালে সঠিক গেজ মাপের নিশ্চয়তা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

(vii)অবশ্যই ক্ষয় প্রতিরোধী হবে।

(v) লাইনচ্যুতিজনিত ক্ষতিগ্রস্ত তাকে প্রতিরোধ করবে।
(vi) এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে, যেন কেবলমাত্র বিশেষ ধরনের টুলস দ্বারা সরানো যায়।
(vii) রেলকে একই লেভেলে, সঠিক স্থানে এবং সঠিক এলাইনমেন্টে রাখতে সহায়তা করে।
(viii) কখনোই দৃঢ় (Rigid) হবে না।
(ix) পার্শ্বীয় বল প্রতিরোধক হবে।
(x) তীব্র ঘূর্ণন বল প্রতিরোধক হবে।
(xi) এটা স্লিপার ও রেলের কোন ক্ষতিসাধন করে না।
(xii) এগুলো আড়াআড়ি শক্তি প্রতিরোধে সক্ষম।
(xiii) এগুলোর উপাংশের সংখ্যা কম হবে।

৩.৩ রেল জয়েন্টের প্রকারভেদ।
(Mention Different Types of Rail Joint):

রেলের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে সংযোজন দুই প্রকার। যথা–

(i) স্কয়ার জয়েন্ট (Square joint)
(ii) স্টেগার্ড জয়েন্ট (Staggered joint)

স্লিপারের অবস্থানের উপর বেল সংযোজন তিন প্রকার। যথা–

(i) স্থাপিত সংযোজন (Supported joint)
(ii) কুলন্ত সংযোজন (Suspended joint)
(iii) সেতু সংযোজন বা ব্রিজ জয়েন্ট (Bridge joint)।

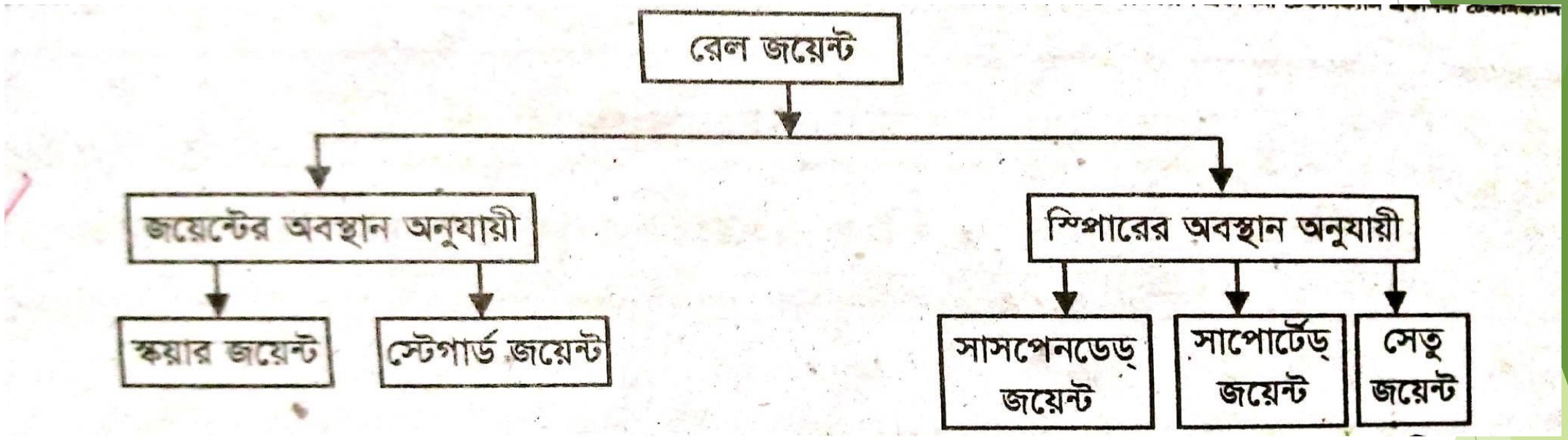
রেল জয়েন্ট
জয়েন্টের অবস্থান অনুযায়ী
স্কয়ার জয়েন্ট
স্টেগার্ড জয়েন্ট
স্লিপারের অবস্থান অনুযায়ী
সাসপেনডেড্ জয়েন্ট
সাপোর্টেড্ জয়েন্ট
সেতু জয়েন্ট

স্কয়ার জয়েন্ট (Square Joint): রেল সড়কের দুই দিকের রেলের জোড়া যদি একই সোজাসুজি দেওয়া হয়, তাকে মাছ। জয়েন্ট বলা হই। আমাদের দেশে এই জাতীয় জয়েনী ব্যবহার করা হচ্ছে। এই জয়েন্ট এ গাড়ি চলাচলের সময় কম ধাক্কার সৃষ্টি হয়।

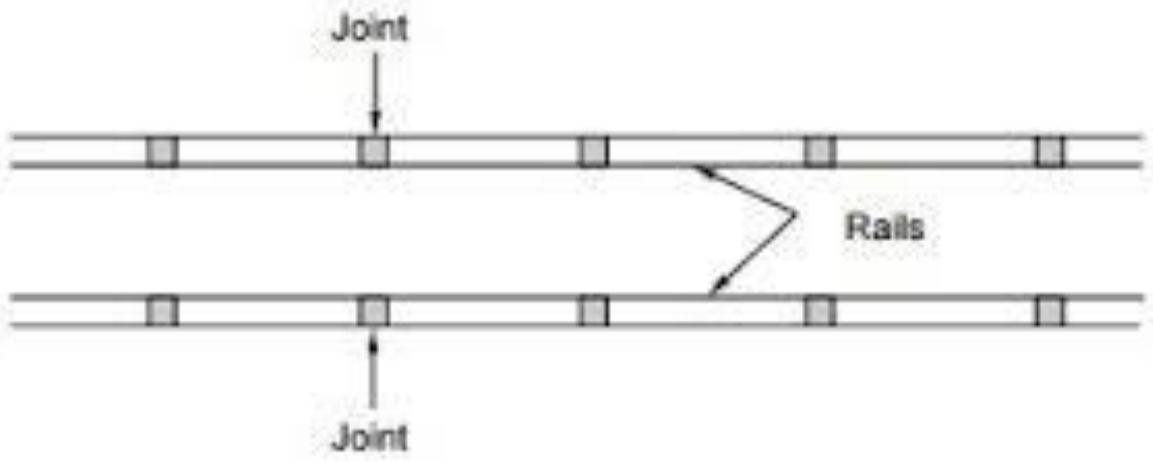

Square joint

স্টেগার্ড জয়েন্ট (Staggered Joint): রেল সড়কের দুই পার্শ্বের রেলের জোড়া যদি একটি অপরটির সোজাসুজি না হা আগে পিছে হয় তখন তাকে Staggered joint বলা হয়। আমাদের দেশে এই জাতীয় জয়েন্টের ব্যবহার নেই বললে চলে। আমেরিকায় এই জাতীয় সংযোজন ব্যবহার করা হচ্ছে। সাধারণ বাঁকে এ ধরনের জোড়া ব্যবহৃত হয়।

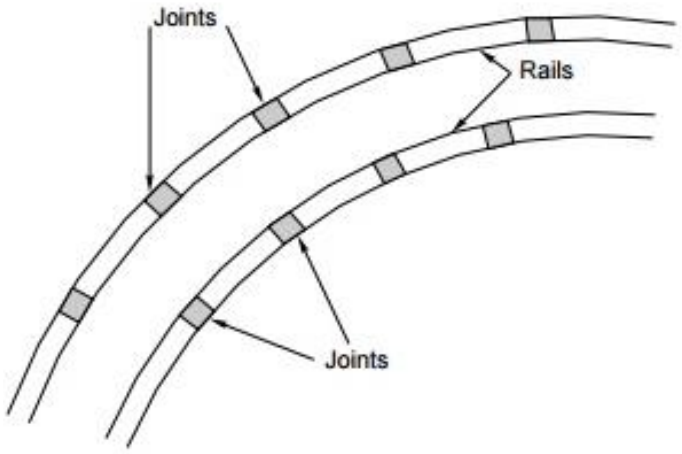

Fig. 16.5 Staggered joint

স্থাপিত সংযোজন (Supported Joint): এই জাতীয় রেল সংযোজনে রেলের প্রান্তষয় স্লিপারের উপর অবস্থান করবে। এই ধরনের সংযোজনের প্রয়োজন নেই বললেই চলে। কেননা এই প্রকার সংযোজনে যে স্লিপার'এর উপর রেলের প্রান্তজ্ঞা অবস্থান করে। গাড়ির আগত ওজনের ফলে স্লিপার কিছুটা নিচে চলে যায়।

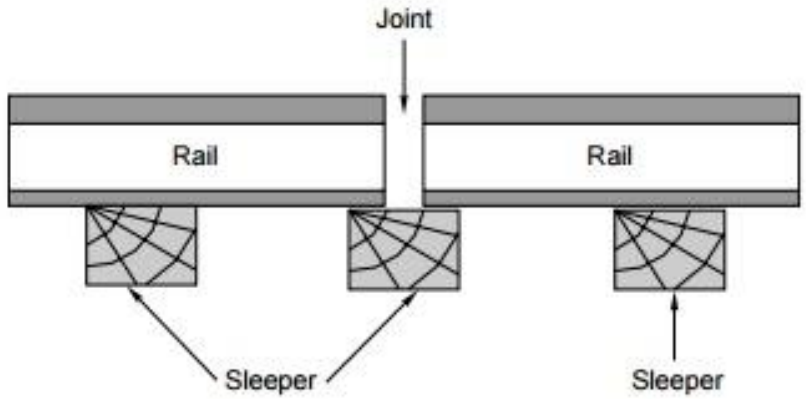

Fig. 16.1 Supported rail joint

স্কুলন্ত সংযোজন (Suspended Joint): এই জাতীয় রেল সংযোজনে রেলের প্রান্তদ্বয় পাশাপাশি দুটি সংবোজলে স্লিপারের মাঝখানে ফুলন্ত অবস্থায় থাকে। এই জাতীয় রেল সংযোজন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গাড়ি হতে আগত গুরু পাশাপাশি দুটি সংযোগছয় স্লিপার এর উপর সমানভাবে ভাগ হয়ে যায় এবং সংযোগস্থল ভালোভাবে দোল খেতে পারে এন রেলের সৃষ্ট ঢেউগুলো ভালোভাবে খেলতে পারে।

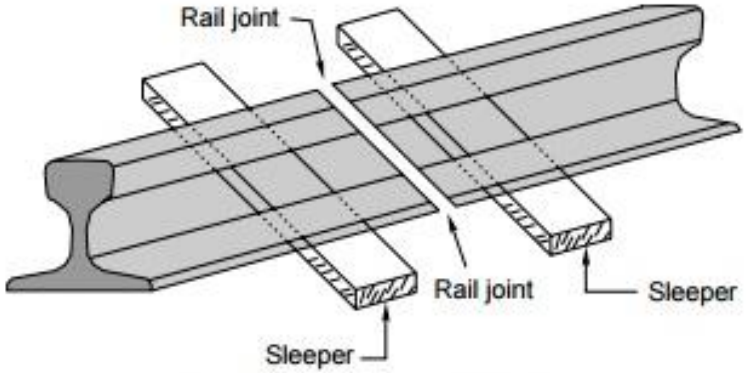

Fig. 16.2 Suspended joint

সেতু সংযোজন বা ব্রিজ জয়েন্ট (Bridge Joint): এই জাতীয় জয়েন্ট অনেকটা ঝুলন্ত জয়েন্ট এর মতো। এ ছোট সংযোগ স্লিপার এর উপর একটি লোহার পাত খাঁজ কেটে বসানো হয় এবং উক্ত পাতের উপর রেসের প্রান্ত অবস্থান করবে।

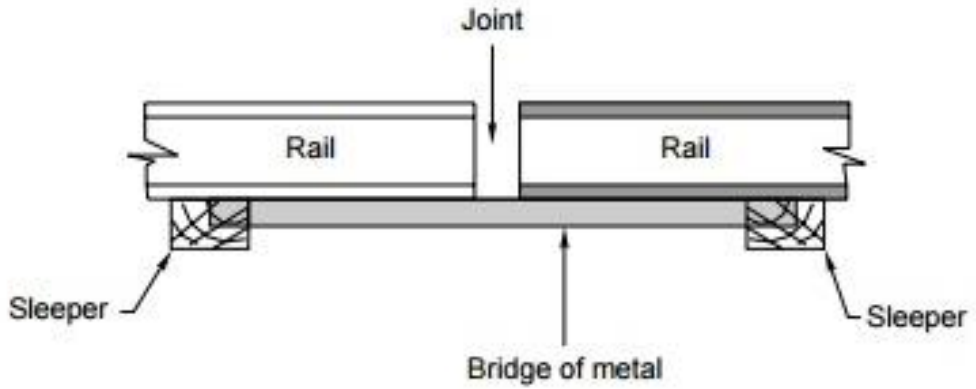

Fig. 16.3 (a) Bridge joint with metal flat

ওয়েল্ডিং জয়েন্ট এর বর্ণনা
(Describe Welding Joint)

নানাবিধ কারণে অধিক লম্বাকৃত রেল পাওয়া সম্ভব হয় না। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, রেলের দৈর্ঘ্য 20 মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। জোড়া হলো রেলের সবচেয়ে দুর্বলতম স্থান। কাজেই জোড়ার সংখ্যা কমানোর জন্য রেলের দৈর্ঘ্য বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য রেলের প্রান্তগুলো উষ্চতাপে গলিয়ে জোড়া দিয়ে রেলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা হয়। এভাবে ওয়েল্ডিং করে রেল জোড়া দেওয়াকে ওয়েল্ডেড রেল বলে। রেলের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত 4টি পদ্ধতিতে ওয়েল্ডিং করা হয়।

(i) ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং (Electric arc welding)
(ii)অক্সি–অ্যাসিটিলিন ওয়েল্ডিং (Oxy-acetylene welding)
(iii) কেমিক্যাল বা থার্মিট ওয়েল্ডিং (Chemical or Thermit welding
(iv)ফ্লাশ বাট ওয়েল্ডিং (Flash-butt welding)

চতুর্থ অধ্যায়
স্থায়ী সড়কে স্লিপার এর ব্যবহার

৪.১ রেলওয়ে স্লিপারের বর্ণনা এবং কার্যাবলি অধ্যায় (Describe and Functions of Railway Sleeper):

৪.১.১ স্লিপারের বর্ণনা (State the Meaning of Sleeper):

রেলসড়ক তৈরি করার সময় যে কাঠামোর উপর রেলকে সংযুক্ত করা হয় সে কাঠামোকে স্লিপার বলে। রেলকে সঠিক অবস্থানে রাখার জন্য রেলের নিচে আড়াআড়িভাবে স্লিপার স্থাপন করা হয়। রেলসড়ক তৈরির প্রথম অবস্থায় রেলের নিচে স্লিপার রেলের লম্বালম্বিভাবে ব্যবহার করা হতো। তখন গেজ মাপ ঠিক রাখার জন্য কিছু দূর পর পর টাইবার ব্যবহৃত হয়। আড়াআড়িভাবে স্লিপার স্থাপন করা হয়। বর্তমানে রেলের অন্য কথায়, রেল লাইনকে স্থাপন করার জন্য সড়কের আড়াআড়ি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর যে কাঠের, কংক্রিটের অথবা লোহার দণ্ড ব্যবহার করা হয় তাকে স্লিপার বলে।

৪.১.২ স্লিপারের কার্যাবলি (Mention the Functions of Sleeper):

নিম্নে স্লিপারের কার্যাবলি উল্লেখ করা হলো:

(i) স্লিপার সমান ও শক্তভাবে রেলকে ধরে রাখে।

(ii) সঠিক গেজ মাপ সংরক্ষণ করে।

(iii) রেলের উপর অল্প জায়গায় যে লোড আসে, তা ব্যালাস্টের উপর অধিক জায়গায় ছড়িয়ে দেয়।

(iv) রেল ও ব্যালাস্টের মধ্যে ইলাস্টিক (Elastic) মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং ট্রেনের কম্পন শোষণ করে।

(v) রেল ফ্যাসেনিংগুলো লাইনে সঠিকভাবে স্থাপনে সহায়তা করে।
(vi) স্থায়ী সড়ককে সর্বাঙ্গীণ স্থিতিশীলতা দান করে।
(vii) রেলগুলোকে চাকার ফুদেল ধারির ঢালে বসাবার মতো উপযুক্ত কাত করে ধরে রাখে।
(viii) রেলওয়ে ট্রাকের এলাইনমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করে অর্থাৎ এলাইনমেন্ট রাখতে সাহায্য করে।
(ix) এ স্লিপারগুলো রেলকে যথার্থভাবে সার্পোট প্রদান করে।
(x) এগুলো বৈদ্যুতিক রেললাইনে অন্তরক হিসেবে কাজ করে।

৪.৩ স্লিপারের প্রকারভেদ
(Mention the Different Types of Sleeper):

স্লিপার প্রধানত দুই প্রকার। যথা:

(i) উপাদান অনুযায়ী (According to Materials)
(ii) অবস্থান অনুযায়ী (According to Laying)

উপাদান অনুযায়ী স্লিপার আবার তিন প্রকার। যথা:

(১) কাঠের স্লিপার (Wooden Sleeper)

(২) ধাতব স্লিপার (Metal Sleeper)

(ক) কাস্ট আয়রন স্লিপার (Cast Iron Sleeper)

(খ) স্টিল স্লিপার (Steel Sleeper)

(৩) কংক্রিট স্লিপার (Concrete Sleeper)

(ক) রি-ইনফোর্সড কংক্রিট স্লিপার (Reinforced Concrete Sleeper)

(খ) প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার (Pre-stressed Concrete Sleeper)

- অবস্থান অনুসারে স্লিপার দুই প্রকার। যথা–

(১) লম্বালম্বি স্লিপার (Logitudinal Sleeper)

(২) আড়াআড়ি স্লিপার (Transverse Sleeper)

(১) লম্বালম্বি স্লিপার (Longitudinal Sleeper): রেলের নিচে রেলের লম্বালম্বিভাবে যে স্লিপার ব্যবহৃত হয় তাকে লম্বালম্বি স্লিপার বলে। রেল তৈরির শুরুতে এ ধরনের স্লিপার ব্যবহৃত হয়। তখন গেজমাপ ঠিক রাখার জন্য কিছু দূর পরপর টাইবার ব্যবহার করা হত। বর্তমানে এই ধরনের স্লিপারের ব্যবহারের প্রচলন নেই বললেই চলে।

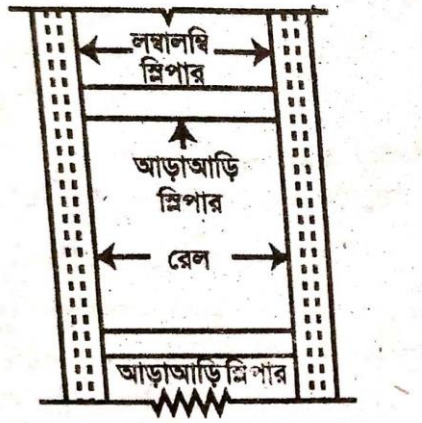

চিত্র- ৪.১ : (ক) লম্বালম্বি স্লিপার

(২) আড়াআড়ি স্লিপার (Transverse Sleeper): রেলের নিচে আড়াআড়িভাবে যে স্লিপার ব্যবহৃত হয় তাকে আড়াআড়ি স্লিপার বলে। বর্তমানে এ জাতীয় স্লিপার বেশি ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় স্লিপার ব্যবহারের ফলে, বেশি গতিতে ট্রেন চলাচলের ফলে ও গেজ মাপের কোনো পরিবর্তন হয় না।

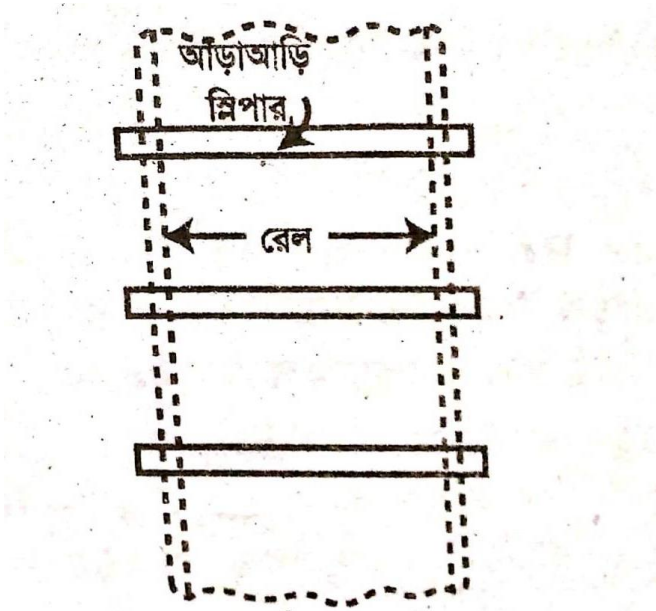

চিত্র-৪.১ : (খ) আড়াআড়ি স্লিপার

৪.৪ কাঠের স্লিপারের সুবিধা ও অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা (Mention the Advantages and Limitations of Timber Sleeper):

➢কাঠের স্লিপারের সুবিধা (Advantages of Timber Sleeper):

(i) ভালভাবে সিজন করা হলে ভাল স্লিপারের সব গুণাবলি এর মধ্যে পাওয়া যায়।
(ii) যেহেতু এটা দেশীয় সামগ্রী দ্বারা তৈরি, সুতরাং দামে সস্তা।
(iii) এটা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।
(iv) রেলকে স্লিপারের সঙ্গে আটকানোর জন্য যে সমস্ত উপকরণ প্রয়োজন হয়, সেগুলো সহজে পাওয়া যায়।
(v) এটা সহজে বসানো যায়, সহজে বদলানো যায়, সহজে প্যাকিং এবং সহজে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।
(vi) এটাতে কম শব্দ উৎপন্ন হয়, ভারি লোডের আঘাত এবং সংকোচন প্রতিরোধ করতে সক্ষম।
(vii) সকল প্রকার ব্যালাস্টের জন্য এটা উপযোগী।
(viii) পয়েন্ট ক্রসিং এবং অন্যান্য সকল স্থানে অনায়াসে লাগানো যায়।
(ix) এগুলো সহজে স্থানান্তর করা যায় এবং স্থানান্তর কালে নষ্ট হয় না।
(x) এগুলো উত্তম অন্তরক বিধায় বৈদ্যুতিক রেল লাইনের জন্যও উপযোগী।

➢ কাঠের স্লিপারের অসুবিধা (Disadvantages of Timber Sleeper):

নিম্নে কাঠের স্লিপার ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হলো:

(i) কাঠের স্লিপার পচনশীল।
(ii) পোকামাকড় সহজে কাঠের স্লিপারের ক্ষতি করতে পারে।
(iii) বারবার গজাল মারার ফলে স্লিপারের প্রান্তদেশ ফেটে যায়।
(iv) এ ধরনের স্লিপারের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের সময় স্পাইকগুলো ঢিলা হয়ে যায়।
(v) কাঠের স্লিপারে গেজ মাপ ঠিক রাখা অপেক্ষাকৃত কঠিন।
(vi) রেলকে একটু কাত করে বসাবার জন্য স্লিপারের উপর খাঁজ কাটবার প্রয়োজন হয়।
(vii) অন্যান্য স্লিপারের তুলনায় এর রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেশি।
(viii) এ স্লিপারের আয়ুষ্কাল তুলনামূলক কম সাধারণত 12 হতে 15 বছর হয়ে থাকে।
(ix) এগুলোর এলাইনমেন্টের রক্ষণাবেক্ষণ কষ্টকর।
(x) এগুলো বক্রতা, ফাটল, রেল কাটিং ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কাঠের স্লিপারের সীমাবদ্ধতা (Limitation of Timber Sleeper):

(i) যদিও কাঠের স্লিপারের মূল্য কম কিন্তু আবহাওয়ার বিরূপতা এবং পোকা মাকড়ের হাত হতে রক্ষার জন্য এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে খরচের পরিমাণ বেড়ে যায়।

(ii) একই শ্রেণিভুক্ত কাঠের স্লিপারগুলোর গুণ ও শক্তি একই রকম হয় না।

(iii) কাঠের প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সোষের জন্য ফিটিংস ব্যবহার কালে এগুলো ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে।

(iv) কাঠ দুষ্প্রাপ্য এলাকায় কাঠের স্লিপারে খরচের পরিমাণ অধিক হয়।

৪.৬ কংক্রিট স্লিপারের সুবিধা ও অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা (Mention the Advantages and Limitations of Concrete Sleeper) :

কংক্রিট স্লিপার (Concrete Sleeper):

এ জাতীয় স্লিপার প্রথম ফ্রান্সে ব্যবহার করা হয়। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর এর ব্যবহার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ইউ কে, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে এই স্লিপার ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে এ জাতীয় স্লিপারের ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ স্লিপারের উপাদান হচ্ছে কোর্স এগ্রিগেট, ফাইন এগ্রিগেট, সিমেন্ট ও লোহা নির্ধারিত ফর্মায় ফেলে তৈরি করা হয়। এর আয়ুষ্কাল 40 থেকে 50 বছর ধরা হয়। কংক্রিট স্লিপার দু প্রকার। যথা:

(1) আরসিসি স্লিপার (RCC Sleeper)

(2) প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার (Pre-stressed Concrete sleeper)

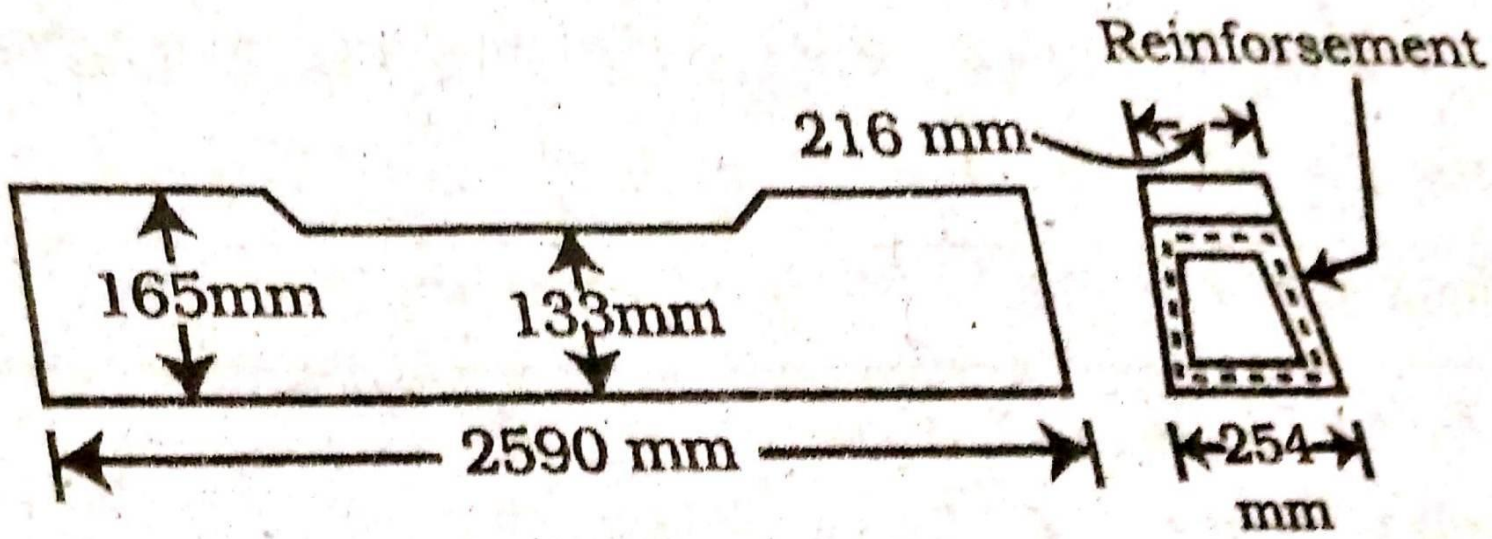

চিত্র- ৪.১০ : কংক্রিটের স্লিপার

কংক্রিট স্লিপারের সুবিধা (Advantages of Concrete Sleeper):

নিম্নে কংক্রিট স্লিপারের সুবিধা উল্লেখ করা হলো:

(i) চালাই লোহা ও ইস্পাতের স্লিপার হতে দামে সস্তা।

(ii) এ জাতীয় স্লিপারে পোকামাকড় কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং মরিচা ধরে না।

(iii) এ স্লিপার গেজ মাপ, আড়াআড়ি লেভেল এবং এলাইনমেন্ট ইত্যাদি সঠিকভাবে বজায় রাখে।

(iv) অধিক চাপ বহন করতে পারে।

(v) স্থানীয় ম্যাটারিয়ালস ব্যবহার করে এটা তৈরি করা যায়।

(vi) এর অনুষ্কাল 40 থেকে 50 বছর ধরা হয়।

(vii) ওমা এগুলো পরিবেশবান্ধব।

(viii) এগুলো দীর্ঘকাল টিকে থাকে।

(ix) এগুলো দাহ্য নয়।

(x) এগুলোর আয়ুষ্কাল অধিক বিধায় অর্থনৈতিক দিক হতে সাশ্রয়ী।

কংক্রিট স্লিপারের অসুবিধা (Disadvantages of Concrete Sleeper):

নিম্নে কংক্রিট স্লিপারের অসুবিধা উল্লেখ করা হলো:

(i)এ স্লিপারে স্পাইক লাগানো কষ্টকর।

(ii) এটি ওজনে বেশি হওয়ায় স্থানান্তর করা কষ্টকর।

(iii) পয়েন্ট ক্রসিং এবং ব্রিজে ব্যবহার করা যায় না।

(iv) কোনো প্রকার স্ক্যাপ ভ্যালু পাওয়া যায় না।

(v) গাড়ির লাইনচ্যুতি এগুলোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে।

সীমাবদ্ধতা (Limitations):

(1) এগুলো যেহেতু কয়েকটি উপাদানের মিশ্রণে রাসায়নিকভাবে জমাটবদ্ধ করে তৈরি করা হয় তাই প্রয়োজনের সময় তাৎক্ষণিকভাবে এগুলো পাওয়া যায় না।

(2) কংক্রিট স্লিপার নির্মাণে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অবশ্যকতা অবিক বিধায় এর ব্যতিক্রম মানসম্পন্ন স্লিপার পাওয়া সম্ভব নয়।

৪.৭ স্লিপারের ঘনত্ব (Explain the Density of Sheepers)

স্লিপারের ঘনত্ব বলতে রেল প্রতি স্লিপারের সংখ্যা বুঝায়। কোনো রেলসড়কে প্রতিটি রেলের দৈর্ঘ্য 10 মিটার হলে, স্লিপারের সংখ্যা n + 1, n + 2, n+ 3 সংকেতে প্রকাশ করা হয়। তবে প্রকাশ থাকে যে, সংযোগস্থলের নিকট এক স্লিপার হতে অন্য স্লপারের দূরত্ব মধ্য অংশের তুলনায় কম হবে। সংযোগস্থলই হলো রেলের দুর্বলতম স্থান। সাধারণত দুটি সংযোগস্থলের মধ্যবর্তী অংশে এক স্লিপার হতে অন্য স্লিপারের কেন্দ্রিক দূরত্ব সাধারণত 75 সে.মি. হতে 90 সে.মি. হয়ে থাকে। স্লিপারের ঘনত্ব নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে–

(১) রেলের উপর আপতিত ভর অথবা গাড়ির গতিবেগের উপর।

(২) যানবাহনের প্রকৃতি ও পরিমাণ।
(৩) স্লিপারের উপাদান।
(৪) ব্যালাস্টের প্রকার ও পরিমাণের উপর।

বাংলাদেশে 12 মিটার হতে 13 মিটার দৈর্ঘ্যের রেল ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ব্রডগেজের জন্য স্লিপারের ঘনত্ব (n + 7) এবং মিটার গেজের জন্য (n + 4) ধরা হয়।

স্লিপারের	বিভিন্ন প্রকার স্লিপার	স্লিপারের সংখ্যা প্রতি রেল	প্রতি কিলোমিটার
n + 7	কাঠের স্লিপার	20	1538
n + 7	ধাতব স্লিপার	20	1538
n + 7	কাঠের স্লিপার	17	1308
n + 7	ধাতব স্লিপার	17	1308

বিভিন্ন গেজ লাইনে স্লিপারের ঘনত্ব:

নিম্নে বিভিন্ন গেজ লাইনে স্লিপারের ঘনত্ব ও ধুরাবাহিত ওজন দেখানো হলো-

গেজ	প্রতি মিটারে রেল সেকশনের ওজন (মিটার)	ধুরাবাহিত ওজন (টনে)	স্লিপারের ঘনত্ব
ব্রড গেজ	77 50 45	28 25 22.50	n + 6 n + 5 n + 4
মিটার গেজ	30 20	13 08	n + 5 n + 1
ন্যারো গেজ	20 10	8.50 3.50	n + 3 n + 1

পঞ্চম অধ্যায়
স্থায়ীভাবে ব্যালাস্ট ব্যবহারের ধারণা

৫.১ ব্যালাস্টের বর্ণনা এবং কার্যাবলি (Describe and Functions of Ballast) :

৫.১.১ ব্যালাস্টের বর্ণনা (State the Meaning of Ballast):

স্থায়ী রেলসড়ক তৈরি করার সময় প্রথমে সড়কের উপরের মাটি কেটে বা ভরাটে একই লেভেলে বা নির্ধারিত তলে আনয় করা হয়। এর উপর যে পাথরের বা ইটের টুকরা ব্যবহার হয় তাকে ব্যালাস্ট বলে। অর্থাৎ স্থায়ী রেলসড়ক তৈরি করার সময় রেলের নিচে স্লিপার স্থাপন করা হয়, স্লিপারের নিচে এবং চার পার্শ্বে যে পাথরের টুকরা অথবা ইটের টুকরা ব্যবহার করা হয় তাকে ব্যালাস্ট বলে। Ballast হলো Railway ট্রাকের ভিত্তি or Foundation।

৫.১.২ ব্যালাস্টের কার্যাবলি (Mention the Functions of Ballast) :

(i) গাড়ির চাকার দ্বারা অর্থাৎ গাড়ি হতে যে ওজন আসে, স্লিপারে এটা ব্যালাস্টের মাধ্যমে ফরমেশন লেভেলে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়।

(ii) স্লিপার স্থাপনের জন্য শক্ত ও সমতল আকার ধারণ করে।

(iii) স্লিপারকে নড়াচড়ায় বাধা প্রদান করে।

(iv) রেলসড়ক হতে তাড়াতাড়ি পানি নিষ্কাশনে সহায়তা করে কর্দম মুক্ত রাখে।

(v) ফরমেশন লেভেলে আগাছা জন্মানো রোধ করে।

(vi) নমনীয় ভাব ধারণ করে।

(vii) কোন কোন সময় ব্যালাস্টের মাধ্যমে রেল সড়কের লেভেল ও ঢাল নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(viii) ফরমেশন লেভেলকে ঠিক রেখে ধীরে ধীরে কাঠিন্য ধারণ করে।

(ix) রেল সড়কের লম্বালম্বি আড়াআড়ি ও খাড়া বিচ্যুতি রোধ করে।

(x) ট্রেন যাতায়াতের সময় Sleeper কে স্বস্থানে থাকতে সহায়তা করে।

(xi) Rail সড়কের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করে।

৫.২ উত্তম ব্যালাস্টের গুণাবলি
(Mention the Characteristics of Good Ballast) :

ব্যালাস্টের জন্য নির্বাচিত উপাদানসমূহের নিম্নবর্ণিত গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত–

(i) একটি উত্তম ব্যালাস্টের যথেষ্ট পরিমাণে চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা থাকতে হবে।

(ii) বিচ্ছিন্ন থাকবার মতো ক্ষমতাশালী হতে হবে।

(iii) লাইনের নিচে স্থির থাকবার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে।

(iv) উত্তম ব্যালাস্ট অত্যধিক পানি শোষণ করবে না।

(i) উত্তম ব্যালাস্ট রেলসড়ক পানি নিষ্কাশন করার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে।
(ii) উত্তম ব্যালাস্টের ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকতে হবে।
(iii) ব্যালাস্টের উপাদান দামে সস্তা এবং সহজলভ্য হবে।
(iv) রেল ও মেটাল স্লিপারে ব্যালাস্টের উপাদান কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটবে না।
(v) ব্যালাস্টের উপাদানসমূহ স্লিপারের অনুভূমিক গতি প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।
(vi) এগুলো ভঙ্গুর হবে না।
(vii) এগুলো ঘর্ষণ ও আবহক্রিয়া রোধে সক্ষম হবে।

৫.৪ব্যালাস্টের গভীরতা (State the Meaning of Depth of Ballast):

ব্যালাস্টের গভীরতা বলতে সাবগ্রেডের উপর হতে স্লিপারের তলা পর্যন্ত খাড়া দূরত্বকে বুঝায়। ব্যালাস্টের গভীরতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ তার উপর ট্র্যাকের বহন ক্ষমতা নির্ণয় করা হয়।

রেল সড়কে দুটি স্লিপারের মধ্যবর্তী দূরত্ব যতটুকু হয় ব্যালাস্টের গভীরতাও ততটুকু হওয়া উচিত। যেসব লাইনে স্লিপার কাছাকাছি বসানো হয় সেসব লাইনে এই নিয়মে ব্যালাস্ট দেওয়া হয়। আমাদের দেশে ৭০ সে.মি. দূরে দূরে স্লিপার স্থাপন করা হয় বলে 90 সে.মি. গভীরতায় ব্যালাস্ট দেওয়া হয় না। আমাদের দেশে ব্রডগেজে 20 সে.মি. এবং মিটার ও সরু গেজে 15 সে.মি. গভীরতা ব্যালাস্ট দেওয়া হয়। তবে ব্যালাস্টের ন্যূনতম গভীরতা 15 সে.মি.।

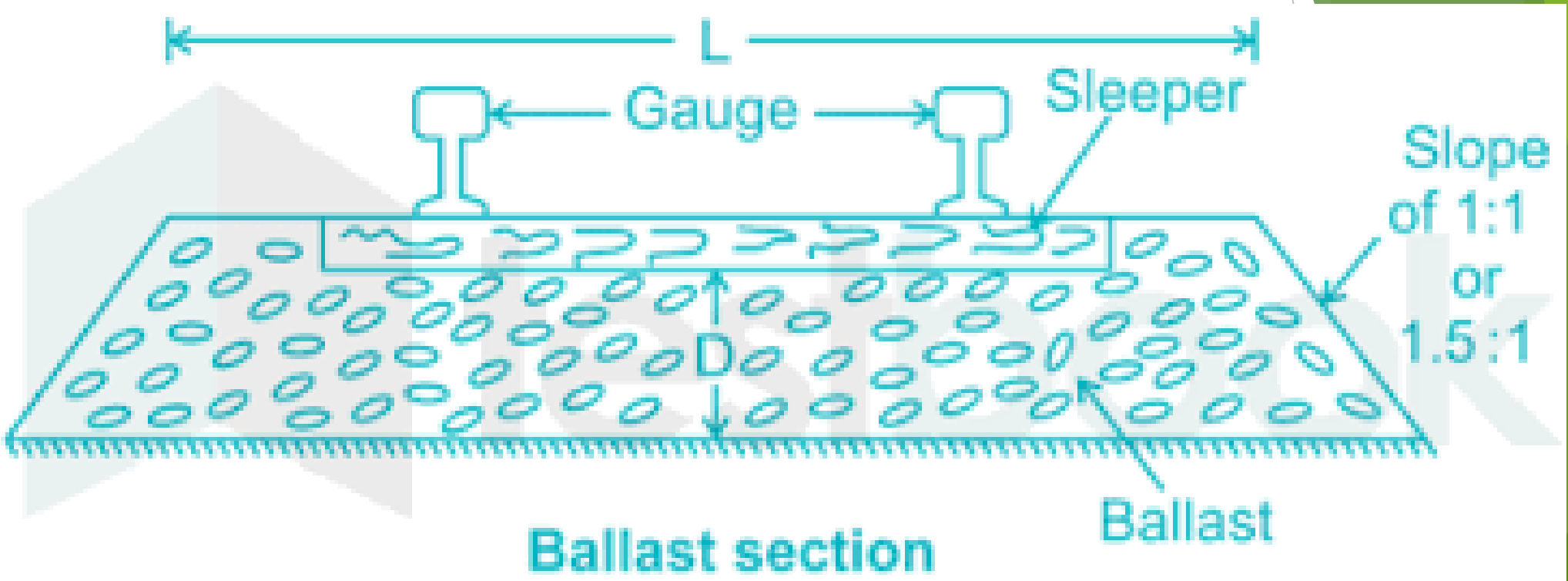

চিত্র: ব্যালাস্টের গভীরতা

গেজ	L সেমি	D mm
ব্রডগেজ	335	200
মিটার গেজ, ন্যারো গেজ	230	150

নিম্নের সূত্রের সাহায্যে ব্যালাস্টের গভীরতা নির্ণয় করা হয়।

$S = B+2\times D$

$D= \frac{S-D}{2}$ সে.মি.

D= ব্যালাস্টের গভীরতা

এখানে,

S= স্লিপারের স্পেসিং

৫.৫ উত্তম ব্যালাস্টের আকার (Specify the Size of Good Quality Ballast):

ব্যালাস্টের আকার সাধারণত 19 মি.মি. হতে 62 মি.মি. পর্যন্ত হতে পারে এবং সবচেয়ে বড় 75 মি.মি. পর্যন্ত হতে পারে। তবে মাঝারি মাপের 19 মি.মি. হতে 51 মি.মি. আকারের ব্যালাস্ট সবচেয়ে ভালো। ব্যালাস্টের আকার সাধারণত স্লিপারের প্রকার এবং ব্যালাস্টের উপাদানের উপর নির্ভর করবে। কাঠের স্লিপারে 4 সে.মি. এবং স্টিল স্লিপারে 5 সে.মি. আকারের ব্যালাস্ট ব্যবহৃত হয়। সুইচ এবং ক্রসিং এ ব্যবহৃত ব্যালাস্টের আকার 25 মি.মি. হয়। ব্যালাস্টের আকৃতি চৌকোণাকৃতি হওয়া উচিত। কারণ এই আকারের ব্যালাস্ট সহজে ভেঙে গুঁড়া হয়ে যায়।

৫.৬ ব্যালাস্ট ছাঁকা বা চালার প্রয়োজনীয়তা (State the Necessity of Screening of Ballast):

অনবরত গাড়ির চাকার হ্যামারিং এর ফলে কিছু কিছু ব্যালাস্ট ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায় এবং কিছু অংশ পাউডারে পরিণত হয়। যদি এগুলো পরিষ্কার করা না হয়, তবে যানবাহন চলাচলের ফলে যে ধুলাবালি ও ডাস্ট এর সৃষ্টি হয় এর সাথে মিশে ব্যালাস্টের মধ্যস্থ ফাঁকগুলো পূরণ করে ফলে ব্যালাস্টের মধ্যে অপ্রবেশস্তর সৃষ্টি করে। এ স্তর ব্যালাস্টের মধ্যে স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা প্রদান করে। এ কারণে ব্যালাস্টের ডাস্ট বা গুঁড়া পরিষ্কার করার জন্য চালুনি দ্বারা ছাঁকা হয়। এই কাজকে ব্যালাস্ট ছাঁকা বা স্ক্রিনিং অব ব্যালাস্ট বলে।

৫.৭ ব্যালাস্ট চালা বা ছাঁকার পদ্ধতি (Describe the Process of Screening of Ballast):

ব্যালাস্ট পরিষ্কার করার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার ব্যালাস্টকে স্ক্রিনিং করা হয় অর্থাৎ চালুনি দ্বারা ছাঁকা হয়।

(i) সারফেস ব্যালাস্ট সাধারণত পরিষ্কার রাখতে হয় এবং ফর্ক (fork) দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করে সতর্কতার সাথে পরিষ্কারকৃত ব্যালাস্টকে উপযোগী স্থানে আলাদা করে রাখা হয়।

(ii) ময়লাযুক্ত ব্যালাস্টগুলোকে তার জালির সাহায্যে ছাঁকা হয়।

(iii) তার জালি ফ্রেমের আকার 150 সে.মি. × 120 সে.মি.। সড়কের উপর অথবা অন্য কোনো সুবিধামতো স্থানে তার জালিটিকে প্রয়োজনমতো কোণে রাখা হয়।

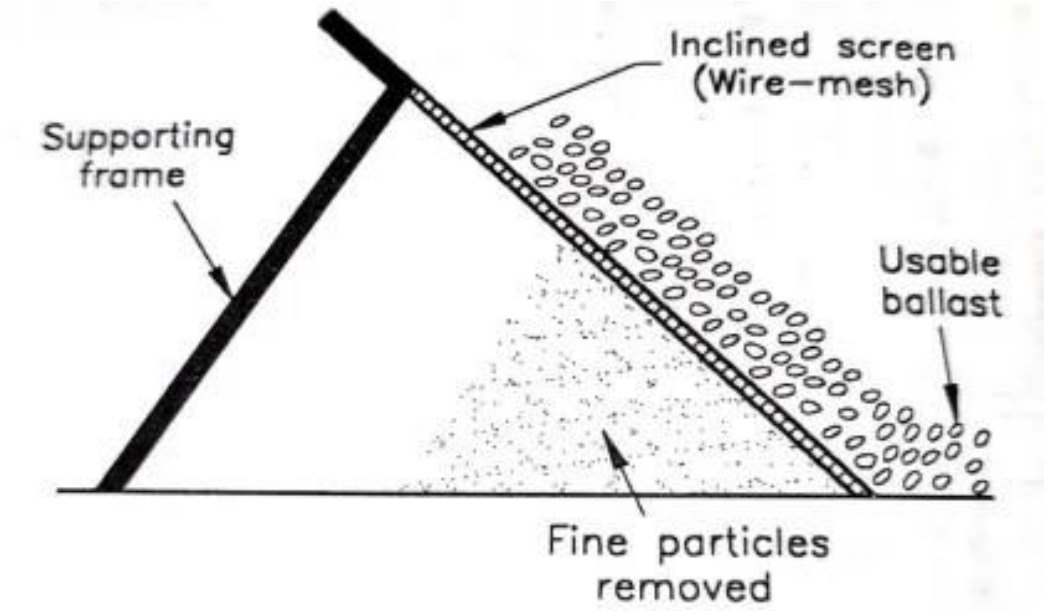

(iv) ময়লাযুক্ত ব্যালাস্ট তার জালির উপর নিক্ষেপ করা হয় ফলে ব্যালাস্ট ডাস্ট নিচে পড়ে যায় এবং ছাকনকৃত ব্যালাস্ট চালুনির সামনে জমা হয়। এই ছাকনকৃত ব্যালাস্টের সাথে প্রয়োজন ব্যালাস্ট যোগ করে লাইন ব্যবহার করা হয়।

৫.৮.২ বক্সিং এবং প্যাকিং (Boxing and Packing):

বক্সিং শিলানো: স্লিপারের নড়াচড়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এর চারপাশে ব্যালাস্ট ছিটিয়ে দেওয়ার কাজকে বক্সিং বা শিলানো বলে। স্লিপার যাতে সামনে ডানে-বায়ে নড়াচড়া করতে না পারে সেজন্য বক্সিং এর প্রয়োজন হয়। প্যাকিং বা গাদানো: স্লিপারের নিচে ব্যালাস্ট বা পাথর কুচি গুতিয়ে গুতিয়ে প্রবেশ করানোর কাজকে প্যাকিং বা গাদানো বলে। স্লিপারের খাড়াভাবে উঠা-নামা বন্ধ করার জন্য প্যাকিং এর প্রয়োজন হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্রীপ বা চলন এবং সুপার এলিভেশন সম্পর্কে ধারণা

৬.১ রেলে ক্রীপ এর অর্থ (State the Meaning of Creep in Rail):

কোন কোন সময় রেলসড়কে ব্যবহৃত রেলগুলো লাইন বরাবর সরে যায়। এই সরে যাওয়াকে ক্রীপ বলে। এ ক্রীপ চলমান ট্রেনের গতির দিকে এবং গতির বিপরীত দিকেও হতে পারে। ঢিলা যুক্ত স্পাইক ত্রুটিযুক্ত পাথরকুচি এবং অপর্যাপ্ত পাথরকুচি ব্যবহার সড়কের ঢাল ইত্যাদির ফলে ট্রেন চলা এবং থামার সময় ক্রীপ হয়। ক্রীপ এর ফলে স্পাইক ভেঙে বা অকেজো হয়ে যায়। স্লিপার স্থানচ্যুত হয় এবং রেল এঁকেবেঁকে যায় |

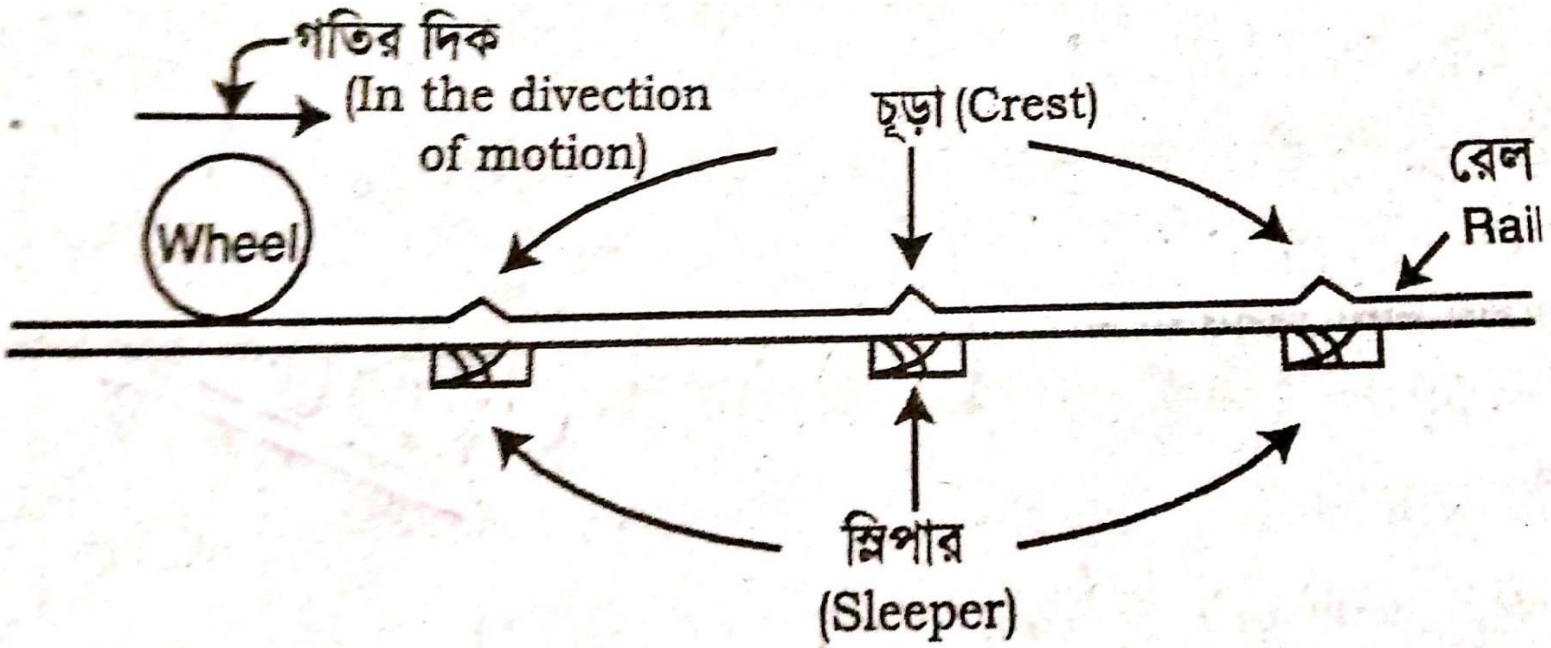
গতির দিক
(In the divection of motion)
চূড়া (Crest)
রেল
Rail
Wheel
স্লিপার
(Sleeper)

চিত্র- ৬.১ : Creep

৬.২ স্থায়ী সড়কে ক্রীপের কারণ সমূহ (Mention the Causes of Creep in Permanent Way):

ক্রীপের কারণ নিম্নে বর্ণিত হলো–

(১) অপ্রতিরোধ্য উপযোগী বা প্রধান কারণ।

(২) প্রতিরোধ্য উপযোগী বা গৌণ কারণ।

অপ্রতিরোধ্য উপযোগী কারণগুলো নিম্নরূপ

(i) চলন্ত ট্রেনের দ্বারা ঢেউ সৃষ্টির দরুন।

(ii) ট্রেন ছাড়ার সময় থামানো ত্বরণ, ধারণ ইত্যাদি ট্রেন ছাড়বার সময় বা ত্বরণের দরুন ট্রেনের চাকা রেলগুলোকে পিয়নের দিকে ঠেলে দেয়।

(iii) তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে রেলের প্রসারণ ও সংকোচনের দরুন।

প্রতিরোধ্য উপযোগী কারণগুলো নিম্নরূপ:

(i) ত্রুটিপূর্ণ স্লিপার ব্যবহার
(ii) চিলাযুক্ত রেল ব্যবহার।
(iii) অপর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা।
(iv) গেজ মাপ সংরক্ষণের ত্রুটি।
(v) ট্রাকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা।
(vi) ত্রুটিপূর্ণ বেল সংযোজন।
(vii) সড়কে ব্যবহৃত রেলের ওজন কম হলে।
(viii) বারবার ব্রেক টেনে ট্রেন থামানো।।
(ix) স্লিপারের ব্যবধান অদম হলে।
(x) অপর্যাপ্ত পাথরকুচি ব্যবহারের ফলে।
(xi) যানবাহন একদিকে বেশি চলাচল করলে।
(xii) স্লিপারের সাথে ডেল শক্তভাবে আটকানো না।

৬.২.১ ক্রীপ প্রসারের কারণাদি
(Explain the Factors to Determine the Magnitude of Creep):

ক্রীপ প্রসার বা মাত্রা বৃদ্ধির জন্য নিচের বিষয়গুলো ভূমিকা রাখে।

(1) ট্রাকের এলাইনমেন্ট (Alignment of Track): ট্রাকের সোজা অংশের তুলনায় বাঁকে ক্রীপের পরিমাণ বেশি হয়।

(ii) ট্রাকের গ্রেডিয়েন্ট (Gradient of Track): ক্রীপ সাধারণত নিম্নমুখী লম্বালম্বি ঢালে উৎপন্ন হয় কিন্তু উর্ধ্বমুখী ঢালে ক্রীপ উৎপন্ন হয় না।

(iii) ট্রেন চলাচলের দিক (Direction of Motion of Trains): একটি নির্দিষ্ট ট্রাকে। একই দিকে যদি একাধিক সংখ্যক গাড়ি চলাচল করে তবে সেই দিকে সাধারণত অধিক ক্রীপ উৎপন্ন হয়।

(iv) এমব্যাংকমেন্ট (Embankment): নতুন তৈরিকৃত এমব্যাংকমেন্টে সাধারণত রেলে ক্রীপ বেশি হয়।

(v) রেলের ধরন এবং ওজন (Weight and Type of Rail): হেভি ওজনের রেলের চেয়ে হালকা ওজনের রেলে ক্রীপের পরিমাণ বেশি হয়। অনুরূপভাবে নতুন রেলের চেয়ে পুরাতন রেলেও বেশি পরিমাণ ক্রীপ উৎপন্ন হয়।

৬.৩ সুপার এলিভেশন প্রভাবিত হওয়ার কারণাদি (Describe the Factors Which Affect the Super Elevation in a Railway Track)

সুপার এলিভেশন প্রভাবিত হওয়ার কারণ নিম্নরূপ–

(i) গাড়ির গতিবেগ।
(ii) বাঁকের ডিগ্রি বা ব্যাসার্ধ।
(iii) সড়কের লম্বালম্বি ঢাল।
(iv) রেল সড়কের গেজ মাপ।
(v) সড়কের ডিজাইন গতিবেগ।
(vi) গাড়ির চাকা ও সড়কের মধ্যে ঘর্ষণ সহগ।
(vii) মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ।

৬.৩.২ সুপার এলিভেশনের উদ্দেশ্য (Mention the Purposes of Super Elevation on a Curve):

বাঁকের উপর নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে সুপার এলিভেশন দেওয়া হয়–

(i) সুপার এলিভেশন কেন্দ্রমুখী বল সৃষ্টি করার মাধ্যমে কেন্দ্রাতিগ বলকে প্রতিহত করে। তাই একে নিরাপদ ও দ্রুত গতিতে গাড়ি চলাচলের উদ্দেশ্যে সুপার এলিভেশন দেওয়া হয়।

(ii) ট্রেনকে লাইনচ্যুত হতে বাধা প্রদান করে।

(iii) সড়কের উভয় পার্শ্বের রেলে প্রায় সমান ভর আনয়ন করার ফলে ট্র্যাকে নিজস্ব স্থান হতে সরে যাবার প্রবণতা থাকে না।

(iv) দিক পরিবর্তনের সময় দ্রুত বাঁক অতিক্রমের সহায়তা করা।

(v) বাঁকে সুপার এলিভেশন দেওয়ার ফলে ট্র্যাকে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম হয়।

(vi) রেলের ক্রীপ ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য।

(vii) নিশ্চিতভাবে নিরাপদে ঝাঁকুনি বিহীন অবস্থায় যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের উদ্দেশ্য।

৬.৪ রেলওয়ে ট্র্যাকে সুপার এলিভেশনের পরিমাণ নির্ণয়

ধরি,

e = সুপার এলিভেশন, মিটারে

G= দুই রেলের মধ্যবর্তী দূরত্ব (গেজমাপ), মিটারে

P = কেন্দ্রাতিগ বল

W= গাড়ির ওজন

V= গাড়ির গতিবেগ মিটার/ সেকেন্ড

g = মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ

R = বাকেঁর ব্যাসার্ধ, মিটারে

V = গারিড়র গতিবেগ কি.মি/ ঘন্টা

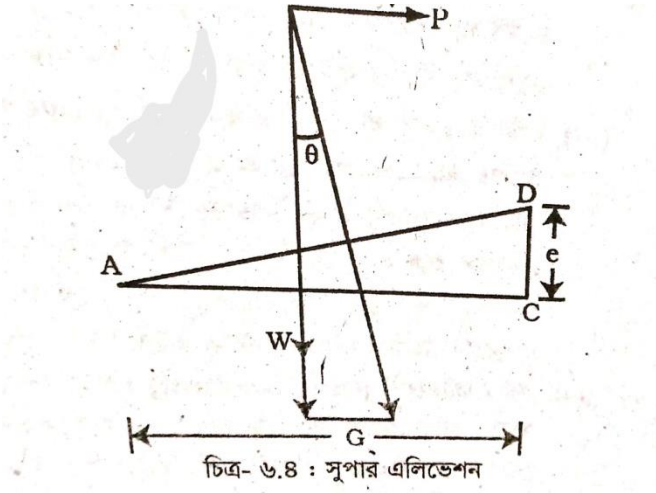

চিত্র- ৬.৪ : সুপার এলিভেশন

যখন $\tan\theta = \frac{\text{সুপার এলিভেশন}}{\text{গেজ মাপ}} = \frac{DC}{AC} = \frac{e}{G} \text{ ----- } (i)$

আবার $\tan\theta = \frac{P}{W} \text{ ----- } (ii)$

(i) ও (ii) নং সমীকরণ হতে আমরা পাই,

$$\frac{e}{G} = \frac{P}{W}$$

বা, $e = \frac{PG}{W} = \frac{WV^2G}{gRW}$ $\quad [\ \therefore P = \frac{WV^2}{gR}\ ]$

$\therefore e = \frac{GV^2}{gR}$

যদি গাড়ির গতিবেগ V কি.মি./ঘন্টা হয়, তবে

$V = \frac{V \times 1000}{60 \times 60} = \frac{V}{3.6}$

$\therefore e = \frac{GV^2}{gR} = \frac{G}{9.81 \times R}\left(\frac{V}{3.6}\right)^2$

$= \frac{GV^2}{127R}$ মিটারে

$= \frac{GV^2}{1.27R}$ সেন্টিমিটারে

৬.৫ সংজ্ঞা লেখ: আড়কাতে স্বল্পতা, ভারসাম্য আড়কাত, উল্টা আড়কাত বা নেগেটিভ ক্যান্ট, ক্যান্ট গ্রেডিয়েন্ট (Define Cant Deficiency, Equilibrium Cant, Negative Cant and Cant Gradient):

(1) আড়কাতের স্বল্পতা (Cant Deficiency): বাঁকের যেখানে পূর্ণ সুপার এপিডেশন প্রয়োগ করা কষ্টকর সেখানে পূর্ণ সুপার এলিভেশন প্রয়োগ না করে কিছুটা সম সুপার এলিডেশর প্রয়োগ করা হয়। পূর্ণ সুপার এলিভেশনের চেয়ে যতটুকু কম সুপার এলিভেশন প্রয়োগ করা হয় তাকে ক্যান্টের স্বল্পতা বা ক্যান্ট ডেফিসিয়েন্সি বলে। বাঁকের যেখানে ক্যান্টের স্বল্পতা বিদ্যমান সেখানে বাইরের চাকা বেশি ভার বহন করে, বাইরের স্প্রিং বেশি সংকুচিত হয় এবং যাত্রীরা বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়। এজন্য বাঁকের উপর যে পরিমাণ ক্যান্ট ডেফিসিয়েন্সি সহ্য করা যায় তার উপর নির্ভর করে গাড়ির গতিবেগ সীমিত করা হয়। ক্যান্টের স্বল্পতার পরিমাণ ব্রড গেছে 76 mm. মিটার গেজে 51 mm এবং ন্যারো গেজে 40 mm.

(ii) ভারসাম্য আড়কাত (Equilibrium Cant):

সড়কের গেজ, মাপ ট্রেনের গতি এবং বাঁকের ব্যাসার্ধের হিসাবে নির্মিত তাত্ত্বিক আড়কাতকে স্থিতি আড়কাত বলে। রেললাইনের উপরে আড়াআড়িভাবে কোনো চাপ পড়ে না। কিন্তু নির্দিষ্ট গতি থেকে ট্রেনের গতি কম হলে বাঁকের ভিতরের লাইনের রেলের মাথায় এবং নির্দিষ্ট গাড়ি থেকে ট্রেনের গতি বেশি হলে বাঁকের বাইরের লাইনে রেলের মাথায় আড়াআড়িভাবে চাপ পড়ে।

(iii) উল্টা আড়কাত বা নেগেটিভ ক্যান্ট (Negative Cant): কোনো সড়কে স্থাপিত বহির্গমন লাইন যদি বাকের উপর স্থাপিত হয় এবং বহির্গমন ও প্রধান লাইনের বাঁক যদি একে অপরের বিপরীত দিকে হয়, তাহলে প্রধান লাইনের আড়কাতের দরুন বাঁকের ভিতরের দিকের রেল বাইরের দিকের বেল থেকে নিচু হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যে বিন্দু থেকে বহির্গমন শুরু হয়। সে বিন্দুতে বহির্গমন উল্টা বাঁক সম্পন্ন হয় বলে প্রধান সাইনের বাঁকের ভিয়ারের বিন্দু থেকে বাইরের বিন্দু নিচু হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বস্তুর অস্থায়ী এই বিন্দুষয় প্রধান লাইনে অবস্থিত বলে এজপ হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে বহির্গমন লাইনের যেদিকে আড়কাত হওয়া প্রকৃত পক্ষে তার ইন্টাদিতে থাকে বলে তাতে উল্টা অতুলার বলে।

(iv) ক্যান্ট গ্রেডিয়েন্ট (Cant Gradient):

সরলপন হতে ট্রাক যে মুহূর্তে বাঁকে প্রবেশ করে, সে মুহূর্তেই মেলে পূর্ব মাত্রার ক্যান্ট প্রয়োগ করা হয় না বরং ক্রান্তি বাঁকের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে ক্যান্ট যোগ করে বৃত্তাকার বাঁকের সংযোগ বিন্দুতে পূর্ণ মাত্রায় ভারসাম্য ক্যান্ট প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ যোহা পাথর সংযোগ দিতে ক্রমান্বয়ে উঁচু চালে অবস্থান করে। এ চালকে ক্যান্ট মেডিয়েন্ট বা ক্যান্ট চাল।

৬.৮ ক্রীপের পরিমাণ এবং সংশোধন করা প্রক্রীয়া ও পরিমাপ বর্ণনা (Describe the Procedure of Measuring the Amount and Correcting of Creep)

৬.৮.১ ক্রীপের পরিমাণ নির্ণয় (Describe the Procedure of Measuring the Amount of Creep) Creep Indicator এর সাহায্যে এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়–

(i) নিচের চিত্র অনুযায়ী বেলের নিচের অংশ (ফ্ল্যাঞ্জে) চিজেল দ্বারা চিহ্ন দেওয়া হয়।)

(ii) দুই রেলের উভয় দিকে দুটি খুঁটি পোঁতা হয়। এই দুই খুঁটির মাথা এবং স্লিপার উপরের অংশ একই সমতলে থাকবে।

(iii) একটি শক্ত তার রেলের আড়াআড়ি দুই খুঁটিতে বেঁধে দেওয়া হয়।

(iv) ট্রেন চলাচলের সময় দেখা যাবে রেলের চিহ্ন দেওয়া স্থান তার থেকে কিছুদূর সরে গিয়েছে, তার থেকে ঐ চিহ্ন দেওয়া স্থান যে পরিমাণ সরে গিয়েছে তাই ক্রীপের পরিমাণ)। অর্থাৎ তার ও রেলের চিহ্নিত স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্বই ক্রীপের পরিমাণ।

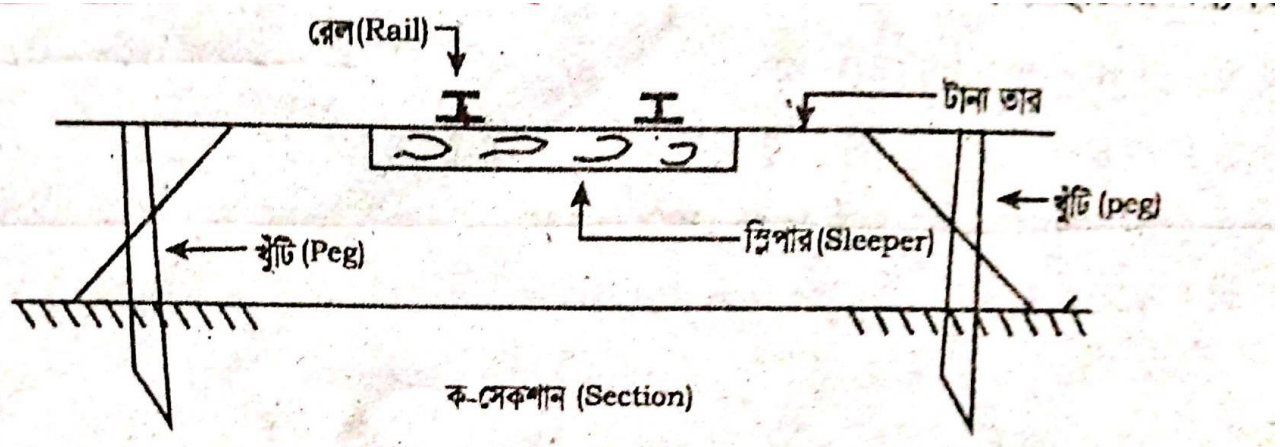

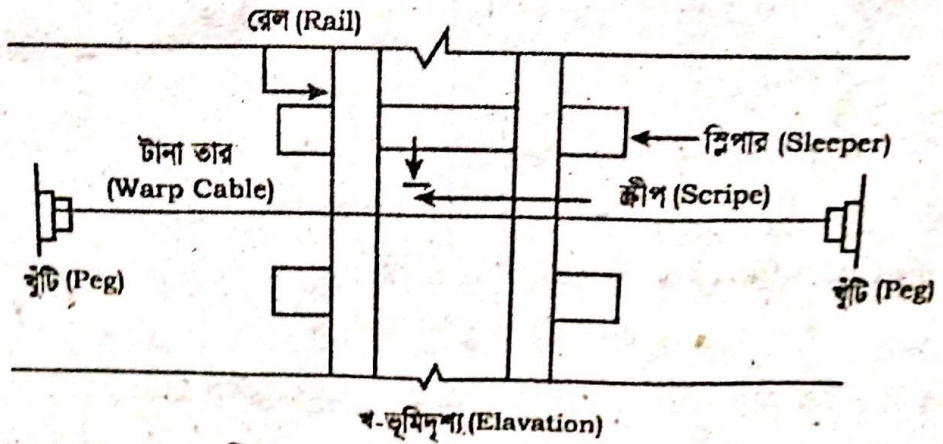

চিত্র- ৬.৫ : ক্রীপ পরিমাপকরণ

সপ্তম অধ্যায়
স্টেশন এবং ইয়ার্ড সম্পর্কে ধারণা

৭.১ রেলওয়ে স্টেশন, পথিপার্শ্ব স্টেশন এবং রেলওয়ে ইয়ার্ড সংজ্ঞা (Define Railway Station, Wayside Station and Railway Yard) :

৭.১.১ রেলওয়ে স্টেশন (Railway Station):

রেললাইনের যে নির্ধারিত স্থানে কোন না কোন কার্য সমাধানের জন্য সময় ও নিয়মমাফিক ট্রেন থামে এবং ছাড়ে তাকে রেলওয়ে স্টেশন বলে। এখানে যাত্রী উঠানামা করে, মালামাল উঠানামার ব্যবস্থাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন হয়, ট্রেনকে পরিচালনার জন্য স্টেশনে কর্তৃপক্ষ থাকে।

৭.১.২ পথিপার্শ্ব স্টেশন (State the Meaning of Wayside Station):

যেসব স্টেশনে যাত্রী ও মালামাল উঠানামা করে কিন্তু ট্রেনের বগিগুলোকে আলাদা করে নতুন কোন ট্রেন গঠন করা হয় না, সেসব স্টেশনকে পথিপার্শ্ব স্টেশন বলে। এ ধরনের স্টেশনে আপ ও ডাউন ট্রেন এবং দ্রুত গতিসম্পন্ন ট্রেনকে ক্রসিং বা ওভারটেকিং করতে সুবিধা প্রদান করে। পথিপার্শ্ব স্টেশন সিঙ্গেল ও ডবল লাইনের হতে পারে।

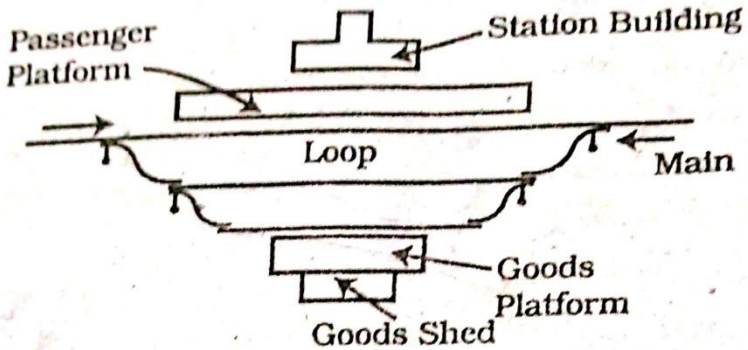

Wayside Station for Single line

চিত্র- ৭.১ : (ক) সিঙ্গেল লাইন পথিপার্শ্ব স্টেশন

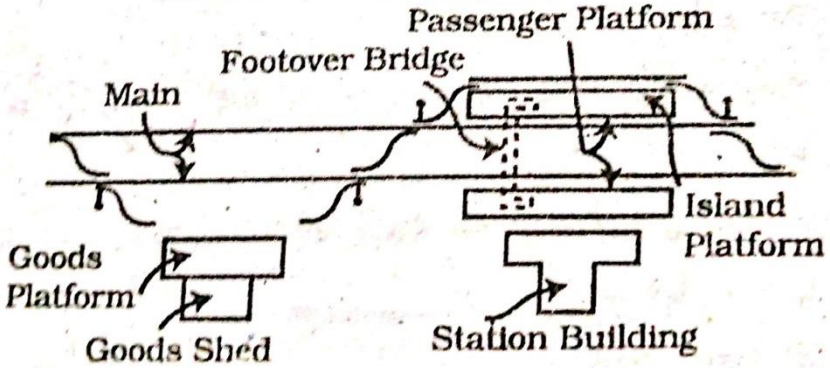

Wayside Station for double lines

চিত্র- ৭.২ : (খ) ডাবল লাইন পথিপার্শ্ব স্টেশন

৭.১.৩ রেলওয়ে আঙিনা (Define Railway Yard): রেললাইনে যাত্রী এবং মালামাল পরিবহনের জন্য বিভিন্ন আঙিনার প্রয়োজন হয়। রেল আঙিনা বলতে নির্দিষ্ট কাজে ব্যবহৃত জায়গা এবং এই জায়গার উপরে অবস্থিত আনুষঙ্গিক কাজে ব্যবহৃত লাইন, গৃহাদি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে বুঝায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতায় যানবাহন (বগি) জমাকরণ, ট্রেন গঠন, ট্রেন হতে বগি বিচ্ছিন্নকরণ, গঠিত ট্রেন প্রস্থানের উপযোগীকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ট্র্যাক স্থাপনের ব্যবস্থাই রেলওয়ে ইয়ার্ড। এ ইয়ার্ডে কোন নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী যানবাহন চলাচল করে না, কিন্তু এগুলো চলাচল কালে নির্দিষ্ট আইন, নিয়ম-কানুন ও সিগন্যাল মেনে চলে।

৭.২ রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশ্য (Mention the Purpose of Railway Station):

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ করা হয়–

(i) যাত্রী এবং মালামাল উঠানামার জন্য।
(ii) ট্রেনের মুভমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।
(iii) একই বেলসড়কে আপ এবং ডাউন ট্রেন চলাচলের জন্য।
(iv) অতিরিক্ত ট্রেনকে স্থান দেওয়ার জন্য।
(v) সুপার এক্সপ্রেস ট্রেন–এর ওভারটেক করার জন্য।
(vi) প্রয়োজনে জ্বালানি এবং পানি সংগ্রহের জন্য।
(vii) প্রয়োজনে ইঞ্জিন ও স্টাফ পরিবর্তন করার জন্য।
(viii) প্রয়োজনে বগি বাড়ানো এবং কমানোর জন্য।
(ix) ট্রেন ধোঁয়া মুছা ও পরিষ্কার করার জন্য।
(x) বগি পরিবর্তন করে নতুন ট্রেন গঠনের জন্য।
(xi) জরুরি অবস্থায় ট্রেনকে স্থান দেওয়ার জন্য।
(xii) দ্রুতগামী রেলগাড়ি, মেইল ট্রেনকে মালগাড়ি ধীরগামী যাত্রীগাড়িতে অতিক্রমের সুযোগ দেওয়ার জন্য।

৭.৩ বিভিন্ন ধরণের রেলওয়ে স্টেশনের প্রকারভেদ (Mention Different Types of Railway Station):

ব্যবহার অনুযায়ী রেলওয়ে স্টেশন প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

(ক) পরিপার্থ স্টেশন (Wayside Station)

(খ) সংযোগকারী স্টেশন (Junction Station)

(গ) যান্ত স্টেশন (Terminal Station)

পরিপার্থ স্টেশনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(1) হলী স্টেশন (Halt Station)

(2) ড্রাগ স্টেশন (Flag Station)

(3) ক্রসিং স্টেশন (Crossing Station)

এছাড়াও প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থান অনুযায়ী স্টেশন আবার তিন প্রকার। যথা:

(i) ব্লক স্টেশন বা মহল স্টেশন (Block Station)

(ii) ফ্লাগ স্টেশন (Flag Station)

(iii) ব্লক কেবিন স্টেশন (Block Cabin Station)

নিম্নে বিভিন্ন ধরনের রেল স্টেশনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলো–

ব্লক স্টেশন (Block Station): এ জাতীয় স্টেশনে রেলগাড়ি, যাত্রী ও মালামাল গ্রহণ ও খালাস করে এবং ট্রেনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

ফ্ল্যাগ স্টেশন (Flag Station): এ ধরনের স্টেশনে যাত্রী ও মালামাল গ্রহণ ও খালাস করে কিন্তু রেলগাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে না।

ব্লক কেবিন স্টেশন (Block Cabin Station): এ জাতীয় স্টেশনে যাত্রী ও মালামাল গ্রহণ ও খালাস করা হয় না কিন্তু রেলগাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পথিপার্থ স্টেশন (Wayside Station): এ জাতীয় স্টেশনে মালামাল ও যাত্রী উঠানামা করে। কিন্তু বগিগুলোকে আলগা করে নতুনভাবে ট্রেন বিন্যাস করা হয় না।

প্রান্তীয় স্টেশন (Terminal Station): এ জাতীয় স্টেশনে কোনো রেলপথ শেষ হয় এবং ট্রেনের বগিগুলোকে আলগা করে পুনরায় প্রয়োজনমতো ট্রেন বিন্যাস করা হয়।
কোন স্টেশনে শাখা লাইন শেষ হলেও তা প্রান্তীয় স্টেশন হিসেবে গণ্য হবে। প্রান্তীয় স্টেশনে ইঞ্জিন ঘুরানোর সুবিধা, অতিরিক্ত পার্শ্ব লাইন, পরীক্ষা গর্ত, ইঞ্জিন দেখাশুনা ও মেরামতের স্থান, মার্শালিং ইয়ার্ড, সারকুলেটিং এরিয়া ইত্যাদি অতিরিক্ত সুবিধা রাখতে হয়। এ ধরনের স্টেশনে অন্যান্য সড়কপথের সাথেও সংযোগ থাকে।

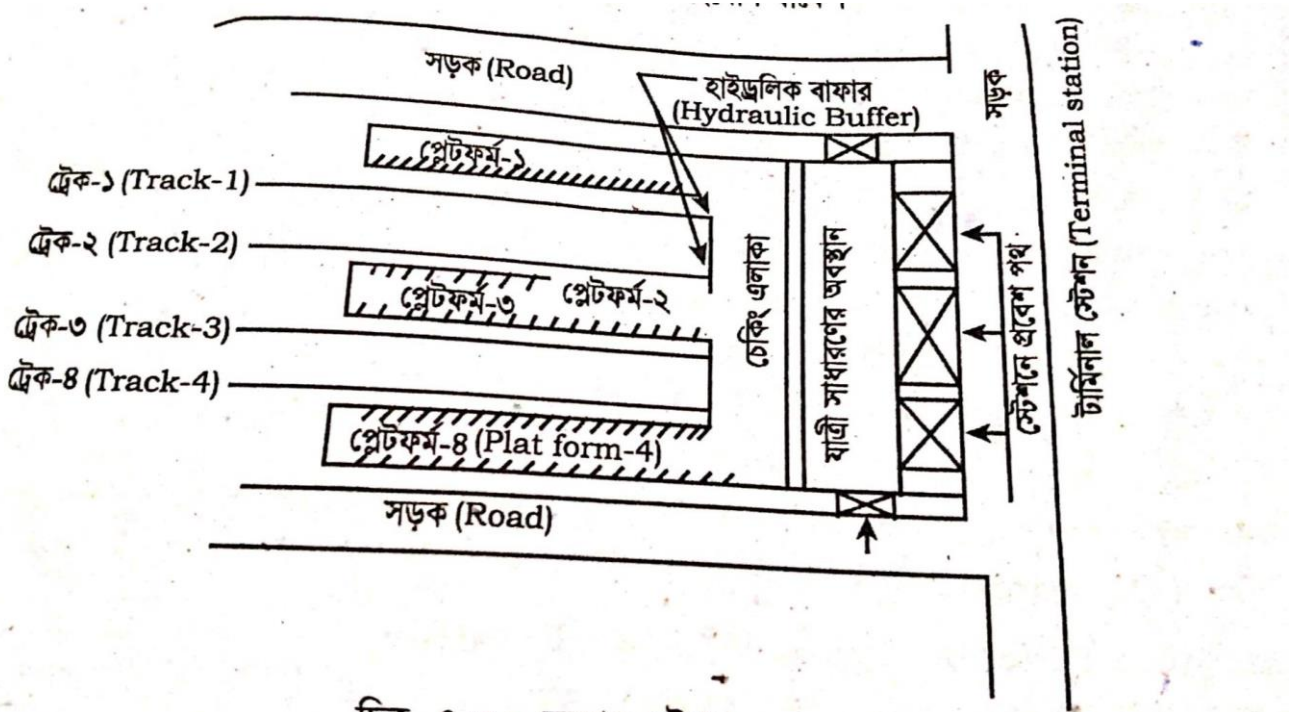

চিত্র- ৭.৩ : জংশন স্টেশন

সংযোগকারী স্টেশন (Junction Station): এ জাতীয় স্টেশনে একাধিক লাইন এসে মিলিত হয় এবং প্রয়োজনবোবে বিভিন্ন পাইনের গাড়ির বগিগুলো বিন্যাস করে নেয়া যায়। এ ধরনের স্টেশনে গাড়ি প্রধান লাইন থেকে শাখা লাইনে এব শাখা লাইন থেকে ট্রেন প্রধান লাইনে নেওয়ার সুবিধা থাকে। তাছাড়াও এগুলোতে যানবাহন মেরামত ও পরিষ্কার করার ব্যবস্থা এবং নতুন ট্রেন গঠন ও ইঞ্জিন পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকে।

রেলওয়ে স্টেশনের প্রয়োজনীয় কাঠামো (Describe the Feature of Railway Station):

রেলওয়ে স্টেশনে নিম্নবর্ণিত কাঠামোগুলো থাকতে হবে–

(ক) জনসাধারণের প্রয়োজনে (Public Requirement)।

(খ) যানবাহনের প্রয়োজনে (Traffic Requirements)।

(গ) লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন বিভাগের প্রয়োজনে (Requirements of Locomotive Department)

(ঘ) সাধারণ প্রয়োজনে (General Requirements) ।

(ক) জনসাধারণের প্রয়োজনে (Public Requirement):

রেল স্টেশনে জনসাধারণের জন্য নিম্নলিখিত সুবিধা থাকা প্রয়োজন–

(i) টিকেট বিক্রয় ও মালামাল বুকিং এর জন্য বুকিং অফিস
(ii) প্লাটফর্ম।
(iii) বিশ্রামাগার।
(iv) খাবার পানির ব্যবস্থা।
(v) চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা।
(vi) পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো।
(vii) স্যানিটারি ব্যবস্থা।
(viii) বাথরুম।
(ix) অনুসন্ধান অফিস।
(x) জনসাধারণের জন্য টেলিফোন।

(xi) স্টেশনে নামের বোর্ড।
(xii) টিকেট তালিকা এবং বিভিন্ন স্টেশনের নামযুক্ত বোর্ড।
(xiii) ঘড়ি রুম।
(xiv) নিরাপত্তার জন্য পুলিশ।
(xv) অভিযোগ জানার জন্য অফিস।
(xvi) মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা (ট্রেনের আগমন ও প্রস্থান প্রচারের জন্য)
(xvii) ভাড়া সংক্রান্ত সাইনবোর্ড।
(xviii) প্রস্থানকারী যাত্রীদের জন্য তথ্যদানকারী অফিস।
(xix) ট্রেনের সময় (আগমন প্রস্থান) সংক্রান্ত সাইনবোর্ড।

(খ) যানবাহনের প্রয়োজনে (Traffic Requirements):

রেল স্টেশনে যানবাহনের প্রয়োজনে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা থাকা প্রয়োজন–

(i) টিকেট তারিখ লেখার যন্ত্র।

(ii) ওজন যন্ত্র।

(iii) ট্রেন চলাচলের জন্য নিয়ন্ত্রিত ও রেকর্ডিং এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকবে।

(iv) ট্রেন চলাচলের জন্য অতিরিক্ত পার্শ্বলাইন।

(v) মাল গুদাম ও মালামালের পার্শ্বলাইন।

(vi) এক বা একাধিক প্লাটফর্ম এবং ওভারব্রিজ।

(গ) লোকোমোটিভ বা ইঞ্জিন বিভাগের জন্য প্রয়োজন:

একটি আদর্শ রেল স্টেশনে লোকোমেটিভ বা ইঞ্জিন বিভাগের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন–

(i) ওয়াটার কলাম।
(ii) জ্বালানি কেন্দ্র।
(iii) টার্ন টেবিল।
(iv) সিগনাল।
(v) বিশেষ বিশেষ স্টেশনে ইঞ্জিন সেড।
(vi) যানবাহন পরীক্ষা করা এবং পরিষ্কার করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
(vii) লোকো স্টাফদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার অপেক্ষাগার ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(ঘ) সাধারণের প্রয়োজনে (general Requirements):

(i) মালামাল পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় কুলি থাকতে হবে।

(ii) নির্দিষ্ট সময় জানার জন্য ঘড়ির ব্যবস্থা থাকবে।

(iii) স্টেশনে আসা যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এপ্রোস রোড থাকবে।

৭.৫ রেলওয়ে স্টেশনের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়াদি (Describe the Points to be considered for Selecting the Site of a Railway Station)

রেলসড়ক স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শহর, বাজার, বিশিষ্ট স্থানসমূহ ইত্যাদির সাথে সংযোগ স্থাপন করা অথবা এসব স্থানের যাত্রী এবং মালামাল পরিবহন সহজ করা। এ কারণে রেল স্টেশন বিশিষ্ট স্থানের নিকটবর্তী হওয়া উচিত। বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়– রেল স্টেশনের স্থান নির্বাচনে নিম্নলিখিত

(i) এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত যেখানে ভূপৃষ্ঠ মোটামুটি সমতল এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সহজ হবে।
(ii) পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাবে।
(iii) এটা নিকটতম শহর বা বড় গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে হওয়া উচিত।
(iv) রেলওয়ে স্টেশনটি ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের জন্য আশপাশে পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি পাওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
(v) রেল স্টেশনের সাথে সড়ক ও জলপথের উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(vi) রেল স্টেশনের নিকটে বাঁক থাকা উচিত নয়।
(vii) যে সমস্ত স্থানে যাত্রী ও মালামালের পরিমাণ অধিক হবে সে ধরনের স্থান নির্বাচন করা উচিত।
(viii) পার্শ্ববর্তী স্টেশন থেকে এর দূরত্ব।
(x) রেল স্টেশনের স্থান নির্বাচনে ভূমির লম্বালম্বি ঢালের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেন থামানো গাড়ি সাধারণ ধাক্কা বা বায়ু প্রবাহে স্থানচ্যুত না হয়।
(x) সর্বোপরি জনসাধারণের চাহিদা সামনে রেখে রেল স্টেশনের স্থান নির্বাচন করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে প্রকৌশল দিক বিবেচনা পূর্বাহ্নে করতে হবে।

৭.৬ বিভিন্ন ধরণের রেলওয়ে আঙিনার শ্রেণিবিভাগ (Describe Different Types of Railway Yard)

রেল আঙিনাগুলো নিম্নরূপ:

(১) যাত্রীদের আঙিনা (Passenger Yards)

(২) মালামালের আঙিনা (Goods Yards)

৩) মার্শালিং ইয়ার্ড (Marshalling Yards)

(৪) লোকোমোটিভ ইয়ার্ড (Locomotive Yards)

(১) যাত্রীদের আঙিনা (Passenger Yards): প্যাসেঞ্জার ইয়ার্ডের প্রধান কাজ হচ্ছে যাত্রীদের নিরাপদ চলাচল এবং যাত্রীদের জন্য যানবাহনের প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করা। জংশন বা টার্মিনাল স্টেশনে অবসর সময়ে যাত্রীবাহী ট্রেন যাতে অবস্থান করতে পারে তার জন্য পৃথক পার্শ্ব লাইনের ব্যবস্থা থাকে।

(২) মালামালের আঙিনা (Goods Yards): এ আঙিনায় মালামাল গ্রহণ, বোঝাই এবং খালাস করা হয়। তবে মালামাল লোডিং এবং আনলোডিং এর জন্য পৃথক পার্শ্ব লাইন থাকে। তবে সব স্টেশনে মালামালের আঙিনা থাকে না, গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনসমূহে এই আঙিনা থাকে।

(৩) মার্শালিং ইয়ার্ড (Marshalling Yard): মার্শালিং ইয়ার্ড বা সাজ আঙিনায় ট্রেনের বগিগুলোকে পৃথক করে প্রয়োজনমতো সাজিয়ে আবার নতুন ট্রেন তৈরি করা হয়। যখন কোনো ট্রেনের ভ্রমণ শেষ হয় তখন প্রয়োজনে ট্রেনের বগিগুলোকে পৃথক করা হয় এবং কোনো কোনো বগি পরিষ্কার ও মেরামত করা দরকার তা পরীক্ষা করে প্রয়োজনে পরিষ্কার ও মেরামত করে নতুন ট্রেন গঠন করা হয়। ট্রেনের মধ্যে পানি ভর্তির কাজও মার্শালিং ইয়ার্ডে করা হয়। সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ জংশন ও টার্মিনালে মার্শালিং ইয়ার্ড তৈরি করা হয়।

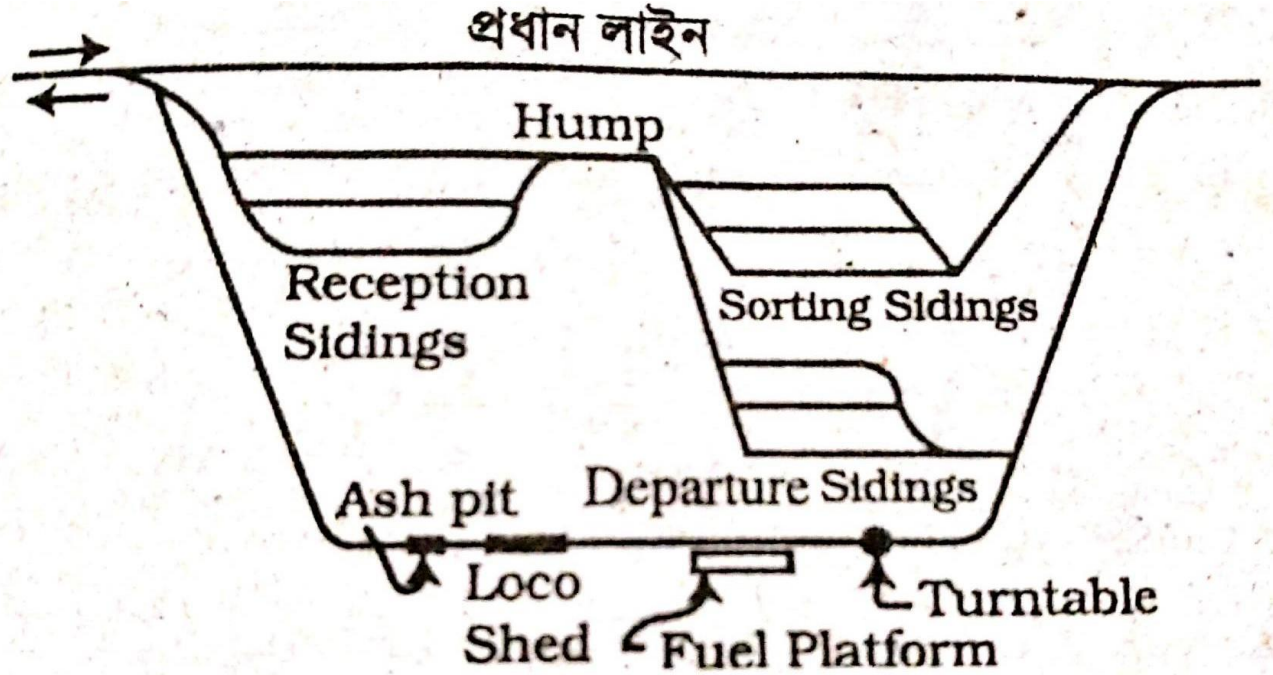

চিত্র- ৭.২ : মার্শালিং ইয়ার্ড

সাজ আঙ্গিনায় আনা ওয়্যাপন/ওয়াগনগুলোকে পরবর্তী যাত্রার জন্য যাত্রা পথের যে স্টেশনে যে ওয়াগন কাটা পড়বে (যেখে যাওয়া হবে) স্টেশনের ধারাবাহিকতায় (১ম স্টেশন, ২য় স্টেশন ওয়াগুণগুলো সাজ মাদিনায় এমনভাবে সাজিয়ে ট্রেন তৈরি করা হয় যেন যাত্রা পথোর প্রথম স্টেশনের প্রথাপন ওয়াগনগুলো সব পিছনে এর পরের স্টেশনের ওয়াগন তার আগে এভাবে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতায় থাকে। ফলে এক নির্দিষ্ট সোশনে পৌছলে সহজেই পিছন হতে ঐ স্টেশনের অংশ কেটে রাখা যায়। মার্শালিং ইওর্ডে বা সাজ আঙ্গিনায় যেসব লাইনগুলোতে এভাবে ওয়াগন সাজানো হয়। ঐ সকল লাইনকে সাজ লাইন বা মাশালিং লাইন বলা হয়।

মাশালিং ইয়ার্ডের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এর ডিজাইনে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নে দেয়া হল।

(i) এর ডিজাইন এমন হবে যেন শান্টিং কালে নিয়মিত ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন না ঘটায়।

(ii)এর ডিজাইন এমন হবে যেন সহজেই অধিক সংখ্যক ওয়াগন অন্যান্য স্টেশনে প্রেরণ করা যায় এবং প্রয়োজনে ওয়াগন জমাও রাখা যায়।

(iii) ভবিষ্যতের প্রয়োজন সম্প্রসারণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(iv) যতদূর সম্ভব চলে রেল লাইনের সাথে এটি সমান্তরাল হবে।

(v)সকল গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে বিশেষ করে জংশন স্টেশনে মার্শালিং ইয়ার্ড থাকবে।

(vi) ওয়াগন একদিকে চলাচলের উপযোগী করে মার্শালিং ইয়ার্ড ডিজাইন করতে হয়। ওয়াগনের উভয় দিকের চলাচল অপচয় বৃদ্ধি করে।

(vii) এর এক বা একাধিক পার্শ্ব লাইনে ওয়াগন মেরামত ও এক ওয়াগন হতে অন্য ওয়াগনে মালামাল স্থানান্তরের সুবিধার জন্য প্লাটফর্ম থাকতে হবে

(viii) মার্শালিং ইয়ার্ড যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এর নির্মাণ ও মেরামত খরচও অধিক। তাই এর ডিজাইনে বেশ সতর্কতা

(ix) মার্শালিং ইয়ার্ডে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(x) অপরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ডিজাইনের অভাবে মার্শালিং ইয়ার্ড ওয়াগনের কবরস্থান হতে পারে।

(xi) মার্শালিং ইয়ার্ডে ওয়াগন নেয়ার পথে ভিড়, শান্টিং-এ বিঘ্নতা ওয়াগনের ক্ষতি, ওয়াগন স্থানান্তর অহেতুক বিলম্ব ইত্যাদি মার্শালিং ইয়ার্ডের গুরুত্ব শূন্য করে দিতে পারে।

(৪) পরীক্ষার লোকোমোটিভ ইয়ার্ড (Locomotive Yard): এ স্থানে ইঞ্জিন এবং বগিগুলোকে পরিষ্কার করা মেরামত করা এবং সার্ভিসিং করা হয়। এছাড়া এখান হতে তেল ও পানি সংগ্রহ করা হয়।

লোকোমেটিক ইয়ার্ড বা পরীক্ষার আঙিনার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে–

(i) ট্রাফিক ইয়ার্ড থেকে টার্ন টেবিল অভিমুখে ট্রেন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারবে।

(ii) লোকোমোটিভকে ইয়ার্ডে প্রবেশে টার্ন টেবিল কোনো রকম বাঁধার কারণ হবে না।

(iii) ট্রাফিক ইয়ার্ড থেকে জ্বালানি প্লাটফর্মে ইঞ্জিন সহজে যেতে পারবে।

(iv) জ্বালানি প্লাটফর্মের লুপ লাইন সর্বোচ্চ লম্বা ট্রেনটিকেও ধারণ করার মতো দীর্ঘ হবে।

(v) মেরামতের জন্য আসা একই সাথে অধিক সংখ্যক ইঞ্জিনকে যেন ইঞ্জিন শেড জায়গা দিতে পারে।

(vi) লোকোশেডের নিকটবর্তী ওভারহেড ট্যাংক ও লোকোওয়েল এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(vii) এই ইয়ার্ড ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা থাকতে হবে।

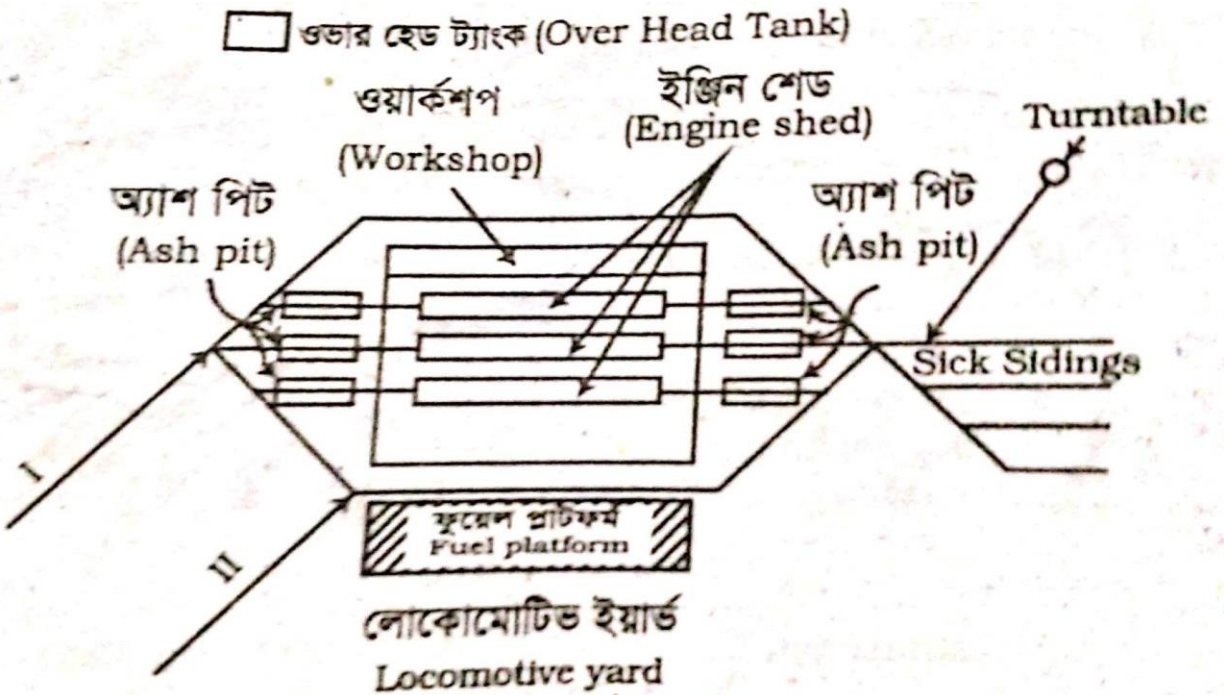

চিত্র- ৭.৭ : লোকোমোটিভ ইয়ার্ড

অষ্টম অধ্যায়
পয়েন্ট ও ক্রসিং সম্পর্কে ধারণা

৮.১ পয়েন্ট ও ক্রসিং-এর সংজ্ঞা (Define Points and Crossings)

সড়ক ও জনপথে যে সমস্ত যানবাহন চলাচল করে সে সমস্ত যানবাহনের ড্রাইভার যানবাহনের সামনের চাকা ঘুরিয়ে দিক পরিবর্তন করে কিন্তু রেলসড়কে যে সমস্ত যানবাহন চলাচল করে এই সমস্ত যানবাহনের দিক পরিবর্তন রেলের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। রেলে যে অংশের মাধ্যমে এই দিক পরিবর্তন এবং বিভিন্ন লাইনে গমনাগমন সংগঠিত হয় তাকে পয়েন্ট এবং ক্রসিং বলে।

পেয়েন্টের সাহায্যে ট্রেনকে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চালিত করে এবং ক্রসিং এর সাহায্যে এক লাইন থেকে অন্য লাইন কেটে পার হয়ে থাকে।।

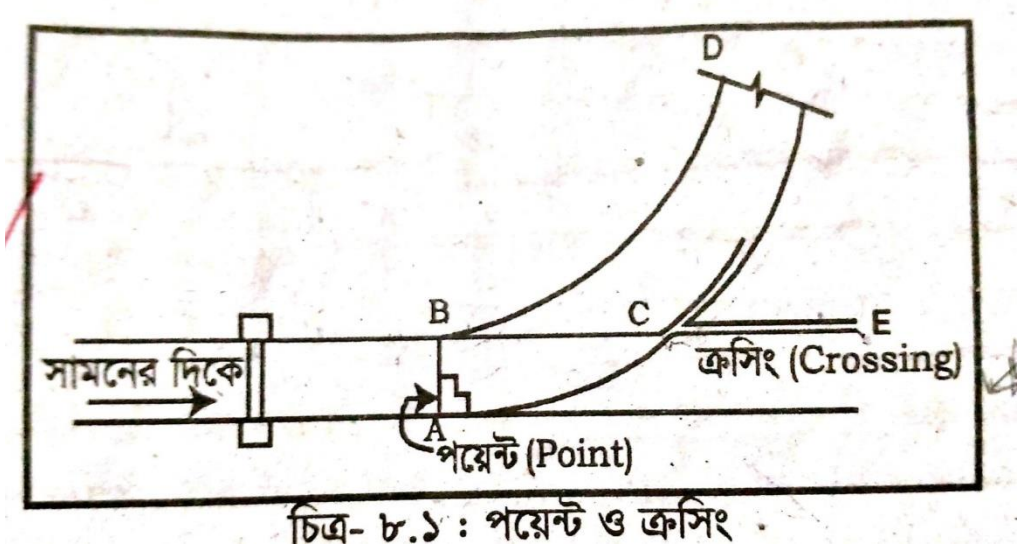

চিত্র- ৮.১ : পয়েন্ট ও ক্রসিং

ট্রেন A ও B বিন্দুতে আসার পর A ও B বিন্দুতে স্থাপিত ব্যবস্থায় রেলগাড়িটি BD মুখী লাইনে গমন করবে। এক্ষেত্রে A ও B পয়েন্ট এবং BE লাইনের C বিন্দুতে স্থাপিত ব্যবস্থার জন্য গাড়িটি BE লাইন পার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে C বিন্দুতে স্থাপিত ব্যবস্থা হলো ক্রসিং।

৮.২ পয়েন্ট এবং ক্রসিংয়ের উদ্দেশ্য (Mention the Purposes of Points and Crossings)

ট্রেনকে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে নেওয়ার জন্য অথবা কোন লাইনকে অন্য কোন লাইনে পার করে নেওয়ার জন্য পয়েন্ট এবং ক্রসিং সোজা ও বাঁকা লাইনের সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত হতে পারে। পয়েন্ট এবং ক্রসিং সাধারণভাবে বহির্গমনে ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে প্রধান লাইন হতে কোনো শাখা লাইন অথবা পার্শ্ব লাইন বের করে নেওয়া যায়।

৮.৩ বিভিন্ন টার্মের সংজ্ঞা (Define the Terms: Switch, Tongue Rail, Check or Guard Rail, Stock Rail, Stretcher Bar, Throw of Switch, Fouling Mark, Right Hand Switch and Left Hand Switch)

(i) সুইচ (Switch): সুইচ হলো পয়েন্ট মিলানোর জন্য যন্ত্র বা কৌশল বিশেষ। যার সাহায্যে রেল সড়কের অংশ বিশেষকে নাড়িয়ে রেল গাড়িকে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চালিত করে। এটা টাঙ্গ রেল এবং স্টক রেল দ্বারা গঠিত। সুইচের টো প্রান্তে অপেক্ষাকৃত হালকা সেকশনের টাঙ্গ রেল ব্যবহৃত হয়। টাঙ্গ রেল স্লাইডিং প্লেটের উপর সহজেই নড়াচড়া করতে পারে এবং সুইচের টো প্রান্তের নিকটে এক জোড়া টাঙ্গ রেল স্ট্রেচার বার দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

সুইচ দুই প্রকার। যথা:

(১) স্টাব সুইচ (Stub Switch)

(২) চেরা সুইচ (Split Switch)

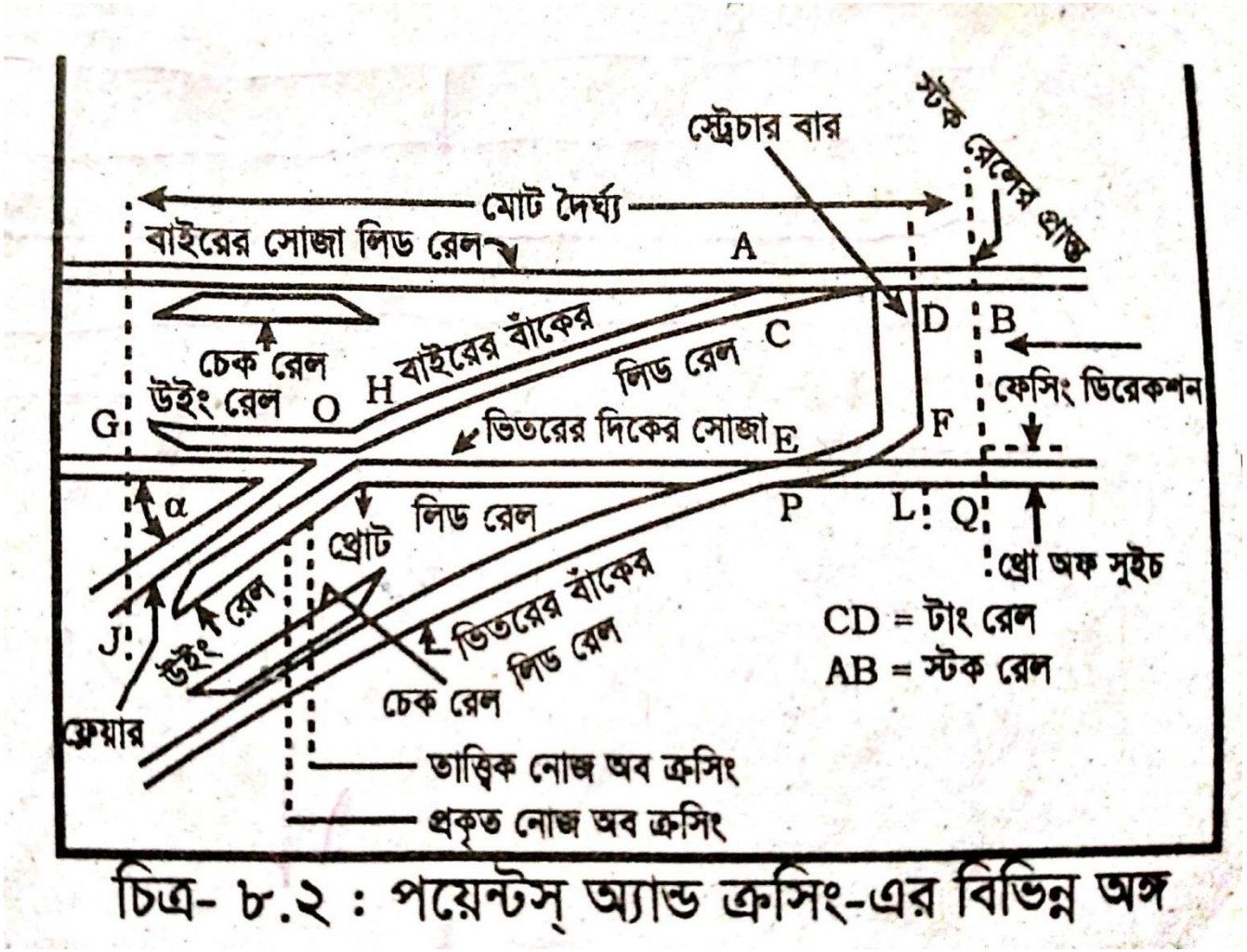

চিত্র- ৮.২ : পয়েন্টস্ অ্যান্ড ক্রসিং-এর বিভিন্ন অঙ্গ

সস্ট্যাব সুইচ (Stub Switch): এ ধরনের সুইচে প্রধান লাইনের অংশ বিশেষকে নাড়িয়ে সরিয়ে গাড়িকে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে চালিত করা হয়। ছবিতে যেভাবে লাইন মিলানো আছে গাড়ি প্রধান লাইন বরাবর চলবে।

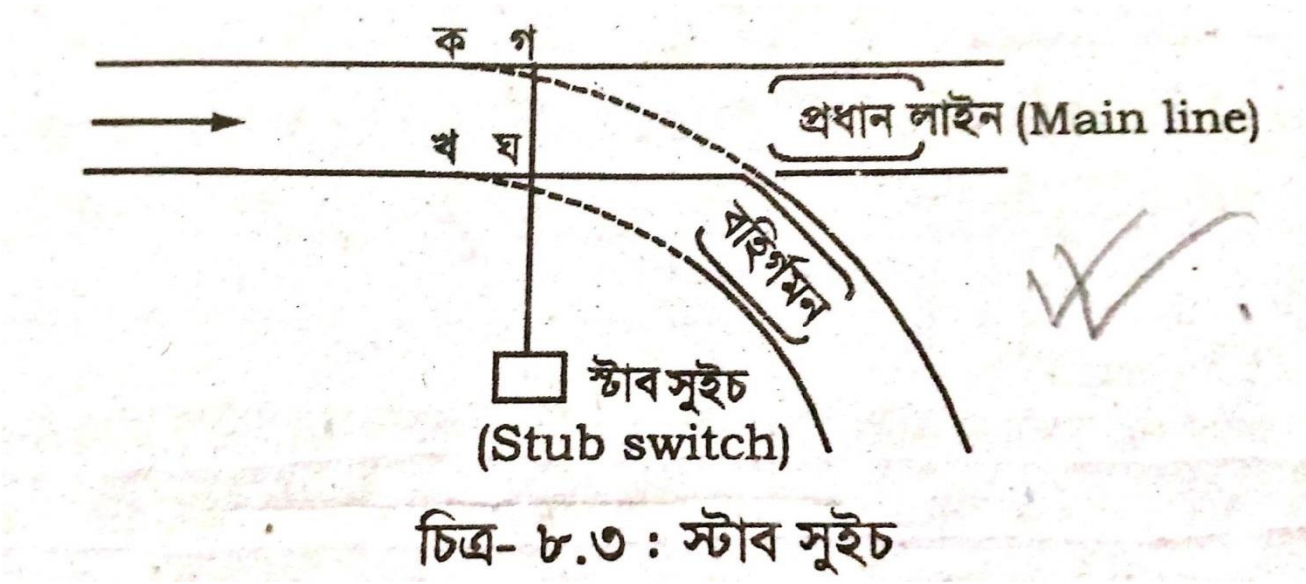

চিত্র- ৮.৩ : স্টাব সুইচ

চেয়া সুইচ (Split Switch): বর্তমানে এই সুইচের প্রচলন খুব বেশি। এই সুইচের বেলায় প্রধান লাইনের রেলকে স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের সুইচ ব্যবহার এ পয়েন্টের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

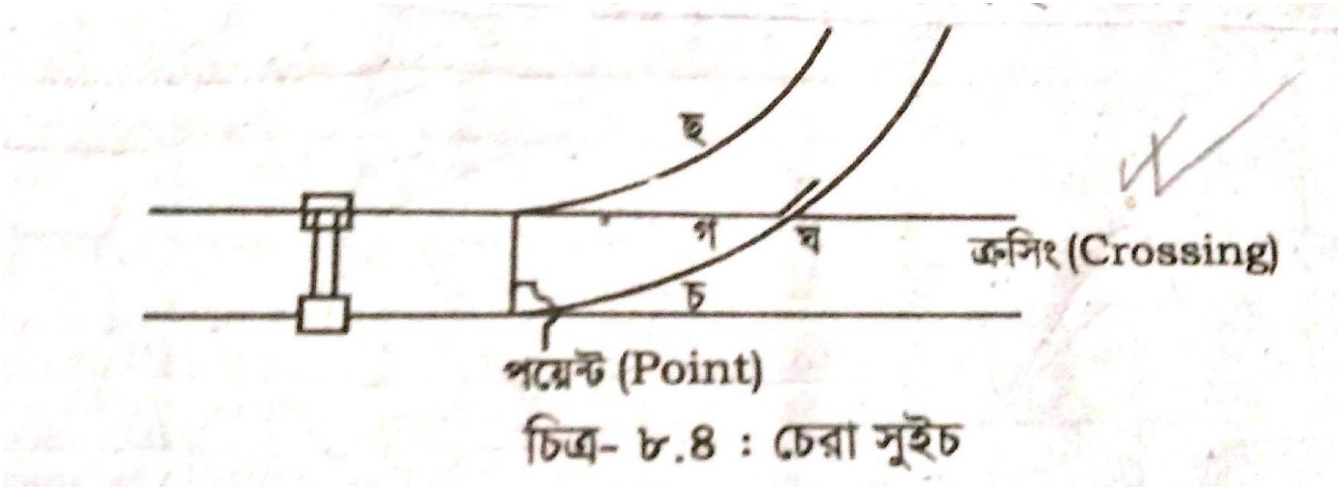

চিত্র- ৮.৪ : চেরা সুইচ

(ii) জিভ রেল (Tongue Rail): পয়েন্ট এবং ক্রসিং এর সুবিধার জন্য যখন রেলের কোনো প্রান্তের এক পাশ চেরা সুইচ চেঁছে ক্রমান্বয়ে ছুঁচালো করা হয়, তখন রেলের ঐ বিশেষ অংশকে জিভ রেল বা টাঙ্গ রেল বলে। অর্থাৎ গোড়ালি থেকে শুরু করে জিভ রেল ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে আগায় একেবার মিলিয়ে যায়। জিভ রেলের এই বিশেষ আকৃতির জন্য স্টক রেলের সাথে রেল সহজেই মিশে বসতে পারে এবং গাড়ির চাকা কাঁধার (Flange) সাহায্যে ধাক্কা খেয়ে অনায়াসে স্টক রেল থেকে জিভ রেলের উপর দিয়ে পার হয়ে নতুন লাইন বরাবর বলতে পারে।

দুটি টানা দণ্ড দ্বারা জিভ রেল আবদ্ধ থাকায় একসঙ্গে এরা সমানভাবে ডানে বায়ে নড়াচড়া করতে পারে। পরিবর্তন দণ্ডের সাহায্যে টেনে বা ঠেলে জিভ রেল তার দিকের স্টক রেল থেকে মাঝখানে ফাঁক সৃষ্টি করে রেলের চাকার বাধাকে পার হয়ে যেতে সাহায্য করে। লাইনে যেসব গাড়ি চলাচল করবে তাদের পাশাপাশি দুই জোড়া চাকার দূরত্বের উপর জিভ রেলের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। তবে সাধারণত 4.5 মিটার থেকে 7.62 মিটার হয়। জিভ রেলের সমস্ত প্রান্তকে সুইচের গোড়ালি (Heel) এবং সুচাগ্র প্রান্তকে টো বা আগা বলে।

(iii) চেক বা রাখি রেল (Check Rail): রেল গাড়ি চলার সময় গাড়ির চাকা ডানে বামে সামান্য দোল খায়। এভাবে দোল খাওয়ার ফলে ক্রসিং পার হওয়ার সময় নাসিকার সঙ্গে চাকার ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা থাকে এবং এই ধাক্কার ফলে নাসিকা ভেঙে যেতে পারে। কাজেই ক্রসিং পার হওয়ার সময় গাড়ির দোল খাওয়া বন্ধ করার জন্য Stock rail এর – সঙ্গে Check rail পেতে Check rail এবং Stock rail এর মাঝে নির্ধারিত পরিমাণ ফাঁক রাখা হয় যাতে গাড়ির চাকা ঐ স্থানে দোল খাওয়া থেকে বিরত থাকে ঐ স্থান অতিক্রম করতে পারে। সুতরাং ক্রসিং ও নাসিকাকে ভাঙনের বা ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করার জন্য Check rail ব্যবহার করা হয়।

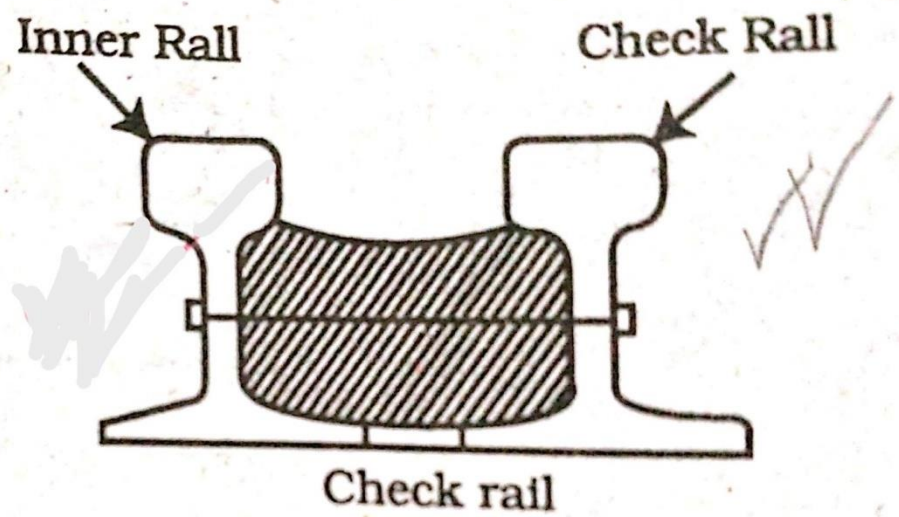

চিত্র- ৮.৫ : চেক রেল

(iv) সংরক্ষণ রেল (Guard Rail): সেতুর উপর গাড়ি কোন কারণে লাইনচ্যুত হলে গাড়ির চাকা যাতে নিচে পড়ে না যায় অথবা সেতুর কোনো অংশের ক্ষতি না হয় সে জন্য গাড়ির চাকা চলাচলকারী দুটি রেলের সমান্তরালে অতিরিক্ত দুটি রেল ব্যবহার করা হয়। এই অতিরিক্ত রেল দুটিকে গার্ড রেল বা সংরক্ষণ রেল। বলে। গার্ড রেল প্রধান রেল হতে 25 সে.মি. দূরে একই সমতলে বসানো হয়। লেভেল ক্রসিং এ এই রেল ব্যবহার করা হয়। তবে সেক্ষেত্রে প্রধান রেল থেকে এই রেলের দূরত্ব 5 সে.মি.। লেভেল ক্রসিং এ গার্ড রেল ব্যবহার করার জন্য বির্ভিন্ন প্রকার গাড়ি আড়াআড়িভাবে রেলের উপর দিয়ে পারাপারের সময় প্রধান লাইনের উপর চাপ কম পড়ে এবং প্রধান রেল কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

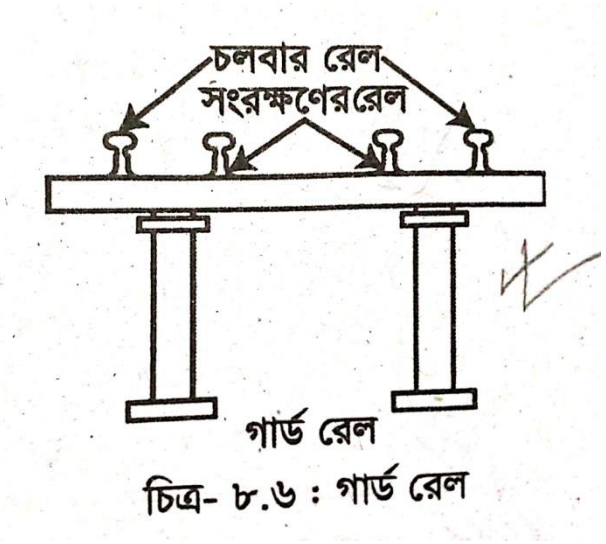

চিত্র- ৮.৬ : গার্ড রেল

(v) টানা দণ্ড (Stretcher Bar): জিভ রেল দুটিকে যে দুটি দণ্ড দ্বারা বাঁধা থাকে তাদেরকে টানা দণ্ড বা স্ট্রেচার বার বলে। এই দণ্ডের সাহায্যে জিভ রেল তার গোড়ালিকে কেন্দ্র করে ডানে বাঁয়ে নড়াচড়া করতে পারে। ফলে ক্রসিং ও পয়েন্টের সুইচ রেল দুটিকে প্রধান বা শাখার লাইনে যুক্ত করা সম্ভব হয়।

(vi) সুইচের নিক্ষেপ (Throw of Switch): এটা এমন একটি দূরত্ব বা গ্যাপ যা ট্রেন চলাচলের জন্য সুইচের টো প্রান্তে জিভ রেলে সহজেই এই দূরত্ব বা গ্যাপ বরাবর নড়াচড়া করতে পারে। এতে ব্রডগেজের জন্য 9.5 সে.মি. এবং মিটার গেজ এবং ন্যারো গেজের জন্য ৪.৭ সে.মি. ধরা হয়। তবে আমেরিকায় 12.1 সে.মি. এবং যুক্তরাজ্যে 10.৪ সে.মি. দেওয়া হয়।

(vii) ফাউলিং মার্ক (Fouling Mark): দুটি রেল সড়কের সংযোগস্থলে এ চিহ্ন রাখা হয়। সংযুক্ত লাইন দুটি একটি লাইনে যদি কোনো ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তাহলে সংযোগস্থল থেকে এমন দূরত্বে ট্রেনটি দাঁড় করানো উচিত যাতে অপর লাইনে আগত ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ না ঘটে। এই সীমা নির্দেশ করার জন্য একটি চিহ্ন দেওয়া যে একে সংক্ষেপে FM বলে। সংযোগস্থলের দিকে এ চিহ্ন পার হয়ে ট্রেনকে থামতে দেওয়া হয় না। অর্থাৎ এক লাইনে দাঁড়ানো ট্রেনের সাথে অপর লাইনের আগত ট্রেনের যাতে কোনো সংঘর্ষ না হয় তার জন্য ঐ চিহ্ন দেওয়া হয়। এই চিহ্নটিকে ফাউলিং মার্ক (Fouling mark) বলে।

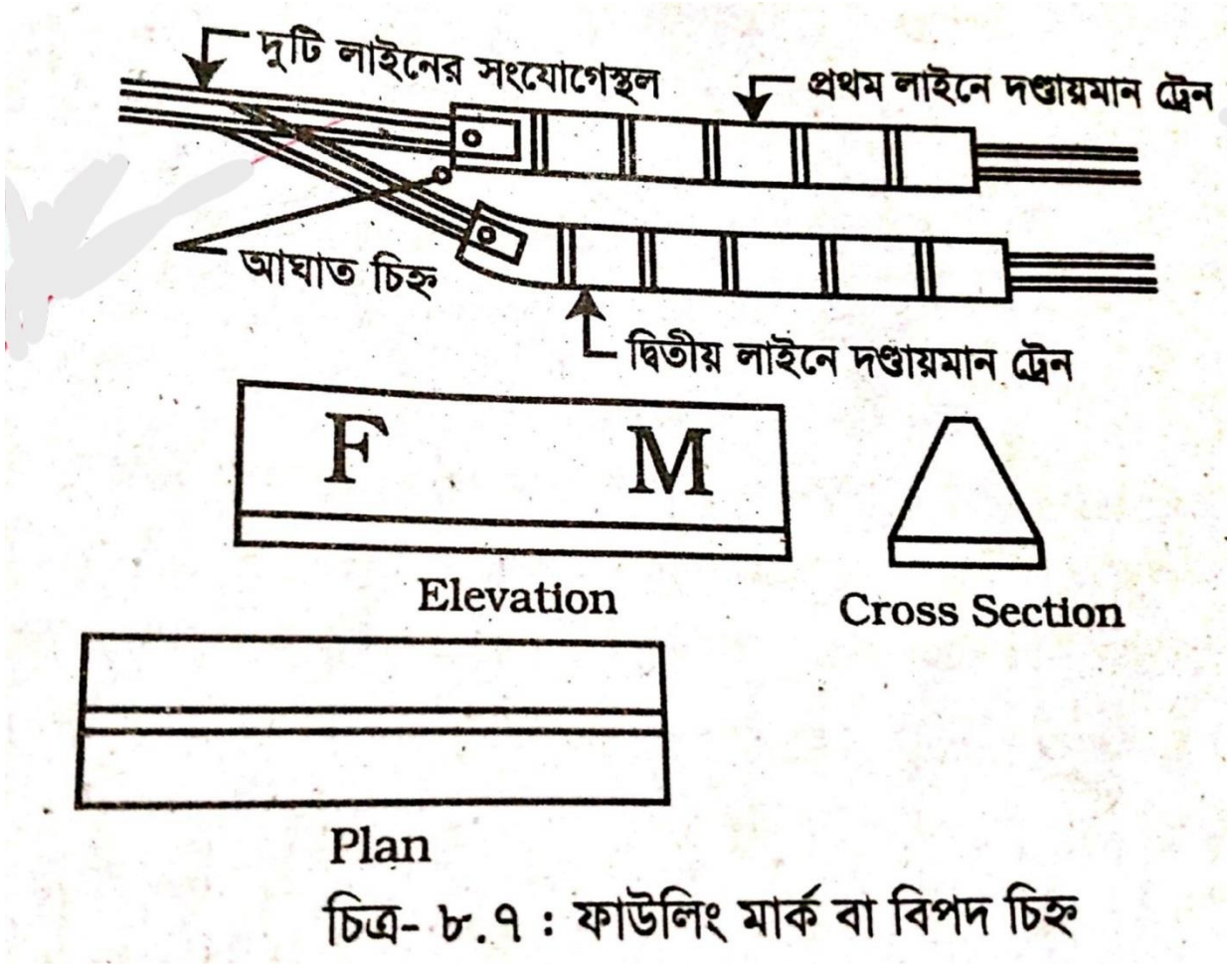

চিত্র- ৮.৭ : ফাউলিং মার্ক বা বিপদ চিহ্ন

(x) টার্ন আউট (Turn Out): রেল সড়কে গাড়ি এক লাইন থেকে অন্য লাইনে নেওয়ার জন্য বা গাড়ির দিক পরিবর্তনের জন্য অথবা প্রধান লাইন থেকে শাখা লাইনে নেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা সংস্থাপন করা হয়, এ ব্যবস্থাকে টার্ন আউট (turn out) বা বহির্গমন ব্যবস্থা বলা হয়। তি এ টার্ন আউট দুই ধরনের

(ক) বামহাতি টার্ন আউট 7 (Left hand turn out) ও

(খ) ডান হাতি টার্ন আউট (Right hand turn out)

গাড়ি চালক যে ব্যবস্থায় তার ডান দিকের লাইনে গাড়িকে নেয়ার ব্যবস্থা করে তাকে ডানহাতি টার্ন আউট এবং বাম দিকের লাইনে নেওয়ার ব্যবস্থাকে বাম হাতি টার্ন আউট বলা হয়। নিম্নে বামহাতি ও ডান হাতি টার্ন আউট ব্যবস্থা দেখানো হলো।

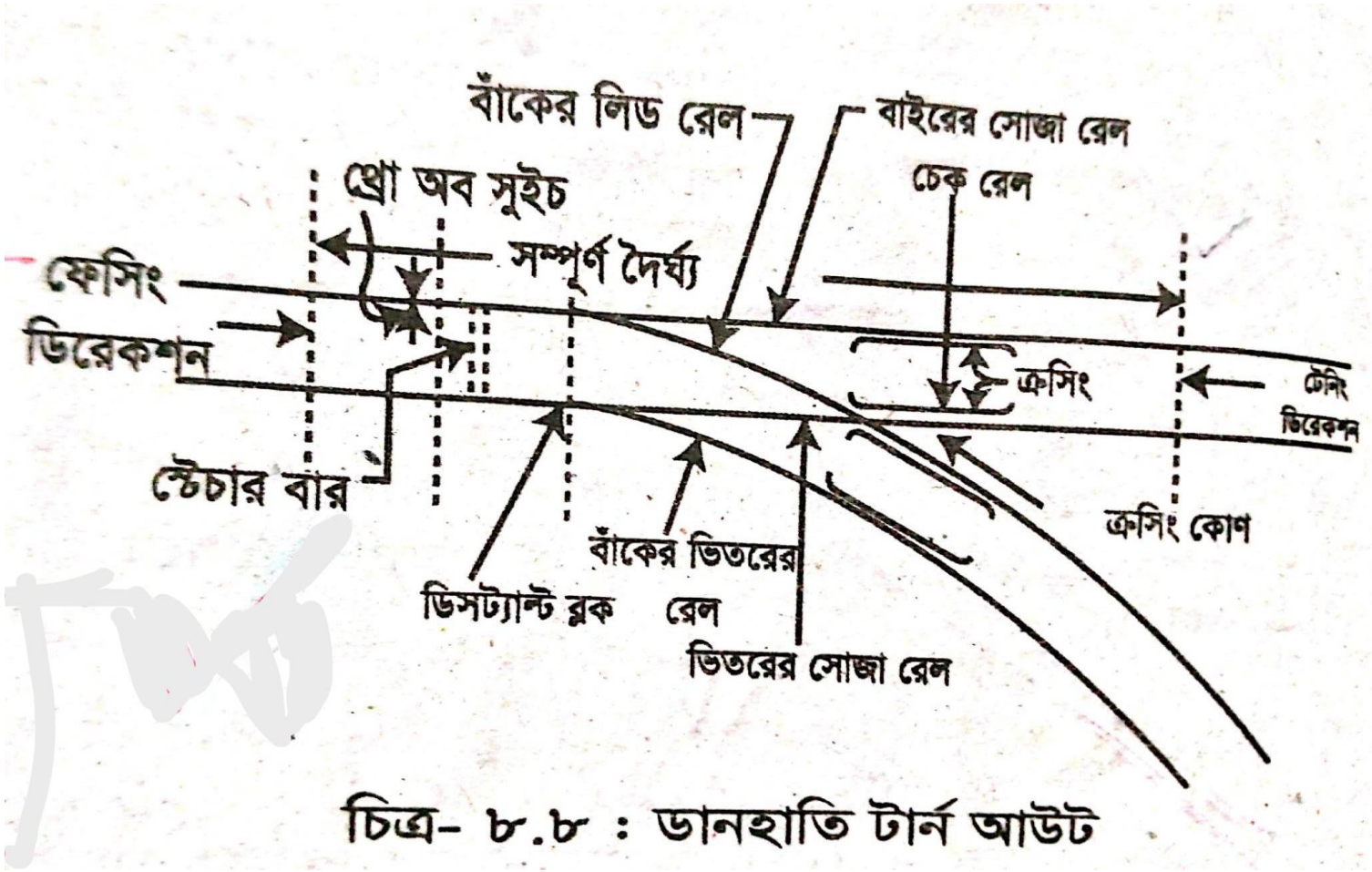

চিত্র- ৮.৮ : ডানহাতি টার্ন আউট

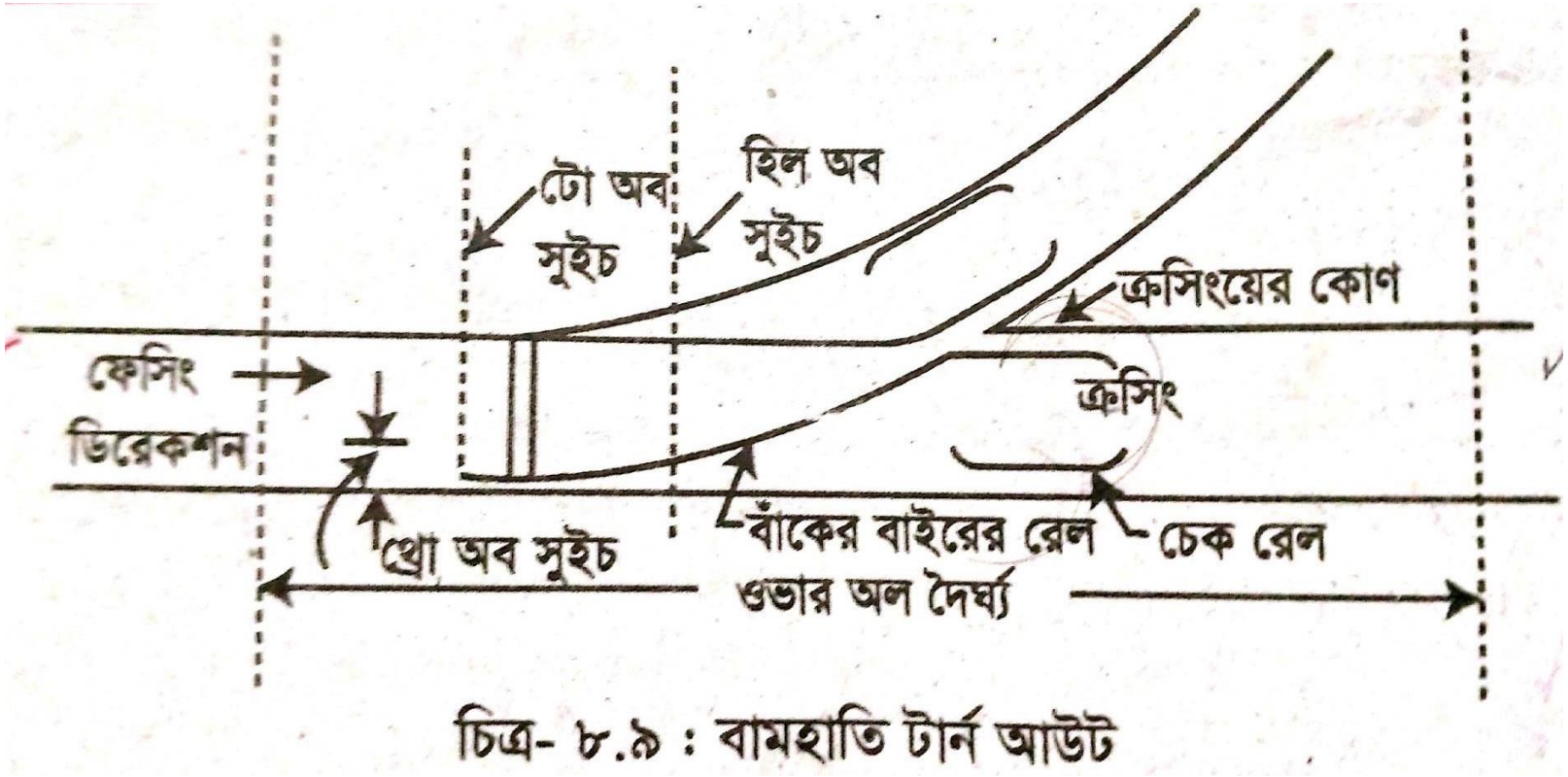

চিত্র- ৮.৯ : বামহাতি টার্ন আউট

নবম অধ্যায়

রেলপথে সিগনালিং এর দিকসমূহ

৯.০ সিগনালিং

(Define Signaling)

সম্মুখবর্তী পথ সম্পর্কে গাড়ি চালককে সতর্ক অথবা নির্দেশ প্রদান করার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাকে সিগনাল বলে। অর্থাৎ এটা হলো এমন একটা ব্যবস্থা যা চালককে সম্মুখবর্তী পথ সম্বন্ধে ধারণা দেয়। যে প্রক্রিয়ায় এই কাজ করা হয় তাকে সিগনালিং বলে। অর্থাৎ রেলগাড়িকে নিয়ন্ত্রিতভাবে বিনা সংঘর্ষে নিরাপদে চলাচলের সুবিধা দানের মাধ্যমে যাত্রী- মালামাল পরিবহনের সর্বোত্তম ব্যবস্থা পদ্ধতিই সিগন্যালিং (Signalling)। সিগন্যালিং এর জন্য যে সকল মাধ্যম (কাঠামো, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয় মূলত এগুলো সিগন্যাল নামে পরিচিত।

সিগন্যালের সাহায্যে রেলগাড়ির চালককে পথ ও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নির্দেশ ও তথ্যাদি অবহিত করানো হয়। কাজেই রেলগাড়ির চলাচল ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সিগন্যালিং এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিপরিতগামী দু'টি রেলগাড়িতে যেন সংঘর্ষ না বাঁধে, দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হতে হয় বা একই দিকে একই লাইনে গমনকারী দু'টি রেলগাড়িতে সংঘর্ষ না হয় এবং রেল লাইনের পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও অধিক সংখ্যক রেলগাড়িকে একই রেল লাইন ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সিগন্যালিং এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৯.১ রেলপথে সিগনালিং-এর গুরুত্ব (Explain the Importance of Signaling in Railways) :

নিম্নে রেল পথে সিগনালিং-এর গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো:

(i) গাড়িকে দুর্ঘটনার হাত হতে রক্ষা করে।
(ii) একই সড়কে একাধিক ট্রেন চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করে।
(iii) শান্টিং এর কাজ নিরাপদ করতে সহায়তা করে।
(iv) সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।
(v) কোনো লাইনে অথবা কোনো প্লাটফর্মে গাড়ি প্রবেশ করে তা নির্দেশ করে।
(vi) ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।
(vii) চলন্ত ট্রেন অন্য ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষ না করে যাতে নিরাপদে পৌঁছাতে পারে এবং যাত্রী ও স্টাফের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে সেজন্য।

৯.২ সিগনালের প্রকারভেদ এবং টপিক্যাল লে-আউট বর্ণনা (Describe Different Types and Typical Layout of Signal)

৯.২.১ সিগনালের প্রকারভেদ (Describe Different Types of Signal)

নিম্নের বিভিন্ন গ্রুপে সিগনালকে ভাগ করা হয়েছে।

(১) কার্য অনুসারে (According to Function)
(২) অবস্থান অনুসারে (According to Their Location)
(৩) বিশেষ উদ্দেশ্যে (According to Their Specific Process)
(৪) পরিচালনা অনুসারে (According to Operation)

(১) কার্য অনুসারে সিগনাল নিম্নরূপ:

(i) স্টপ বা সিমাফোর সিগনাল (Stop signals or Semaphore Type Signals)
(ii) সতর্ক সিগনাল (Warner Signal)
(iii) ডিস্ক বা গ্রাউন্ড সিগনাল (Disk or Ground Signal)
(iv) কালার লাইট সিগনাল (Colored light Signal).

(২) অবস্থান অনুসারে সিগনাল চার প্রকার। যথা :

(i) বাইরের সিগনাল (Outer Signal)
(ii) ঘরের সিগনাল (Home Signal)
(iii) চলার সিগনাল (Starter Signal)
(iv) অগ্রবর্তী চলার (Advance Starter Signal)

(৩) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিগনাল পাঁচ প্রকার। যথা:

(i) পথ নির্দেশ সিগনাল (Routing Signal)
(ii) অতিরিক্ত সিগনাল (Repeating Signal)
(iii) কল অন সিগনাল (Call or Signal)
(iv) শান্টিং সিগনাল (Shunting Signal)
(v) মিশ্রিত সিগনাল (Miscellaneous Signal)

(৪) পরিচালনা অনুসারে সিগনাল তিন প্রকার। যথা:

(i) হাত সিগনাল (Hand Signal)
(ii) স্থির বা ফিক্সড সিগনাল (Fixed Signal)
(iii) ডিটোনেটিং সিগনাল (Detonating Signal)

(i) সিমাফোর সিগনাল (Semaphore Signal) : এটা একটি স্থায়ী সিগনাল। এই সিগনালে একটি খুঁটির সঙ্গে একটি পাখা লাগানো থাকে। পাখাটিকে খুঁটির সঙ্গে সমকোণে অবস্থান করে প্রয়োজনে তা 40°–50° কোণে উপরের দিকে বা নিচের দিকে আনত করা যায়। যদি উপরের দিকে বা নিচের দিকে কাত করা অবস্থায় থাকে তাহলে গাড়ি সামনের দিকে আগানো নিরাপদ। আর যদি খুঁটির সমকোণে অবস্থান করে গাড়ি তাহলে সামনের দিকে আগানো নিরাপদ নয়। তখন গাড়িকে সেখানে থাকতে হবে। উল্লিখিত পাখাটির দৈর্ঘ্য সাধারণত 1.5 মিটার চওড়ায় 25 সে.মি. হতে 30 সে.মি. হয়ে থাকে।

এই পাখার পিছনের দিকে দুই খণ্ড কাঁচ লাগানো থাকে। এক খণ্ড লাল এবং অপর খণ্ড সবুজ রং এর এবং এর পিছনে একটি কাত রাখার খণ্ড সবুজ রং এর এবং এর পিছনে একটি কাত রাখার ব্যবস্থা আছে। বিশেষ করে রাত্রি বেলার জন্য এই বাতি ব্যবহার করা হয়। যখন পাখাটি খুঁটির সমকোণে অবস্থান করবে- তখন লাল কাঠটি বাতির সম্মুখে পড়বে এবং উচ্চ পাখাকে উপরের দিকে বা নিচের দিকে কাত করা হলে সবুজ গ্লাসটি বাতির সম্মুখে পড়বে। ফলে সবুজ আলো দেখা যাবে এবং ড্রাইভারকে সামনের দিকে আগানো নিরাপদ বুঝতে হবে।

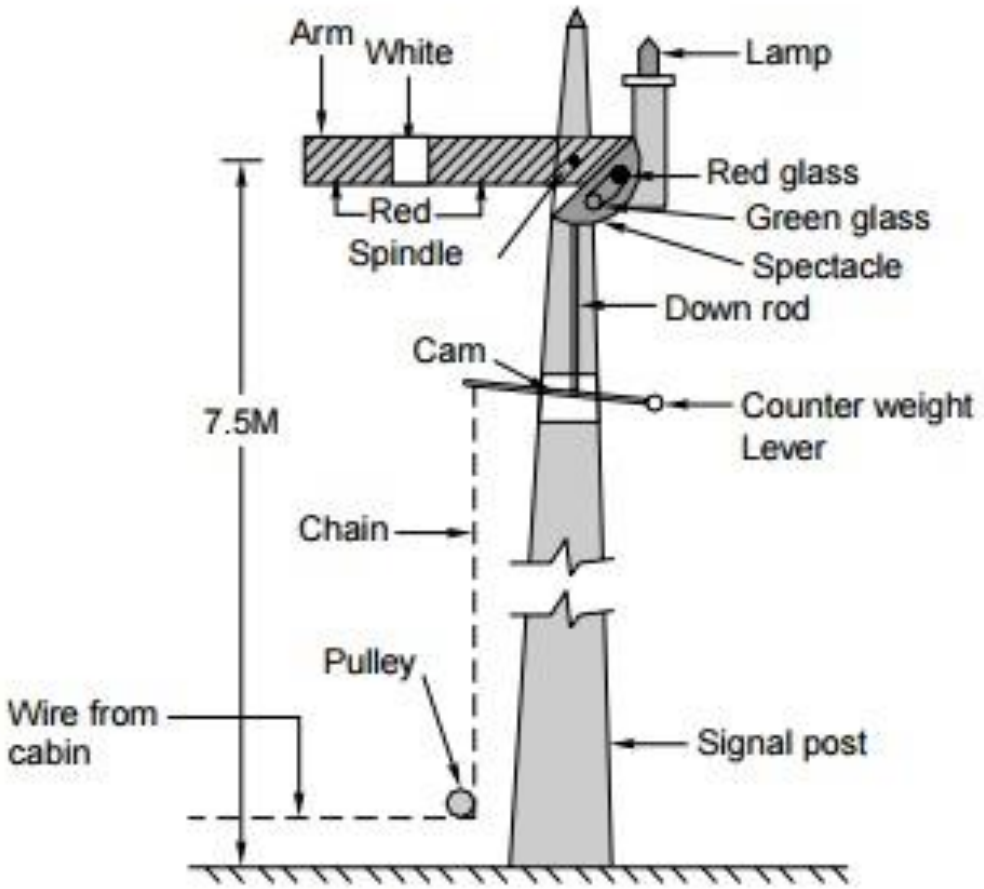

Fig. 31.2 Semaphore signal

(ii) সতর্ক সিগনাল (Warner Signal):

সতর্ক সিগনাল দেখতে অনেকটা সিমাফোর সিগনালের মতোই। তবে এই সিগনালকে সিমাফোর সিগনাল থেকে পৃথক করার জন্য মুক্তপ্রান্তে V নচ আকারে নেট থাকে। V-নচ আকৃতির মুক্ত প্রান্তের নিকটে একটি V আকৃতির সাদা ব্যান্ড থাকে। যেকোনো স্টেশনে এগুবার সময় সর্বপ্রথমেই যে সিগনাল থাকে তাকে সতর্ক সিগনাল বলে। Stop Signal বা থামানোর সিগনাল থেকে এর দূরত্ব 500 মিটার হয়ে থাকে।

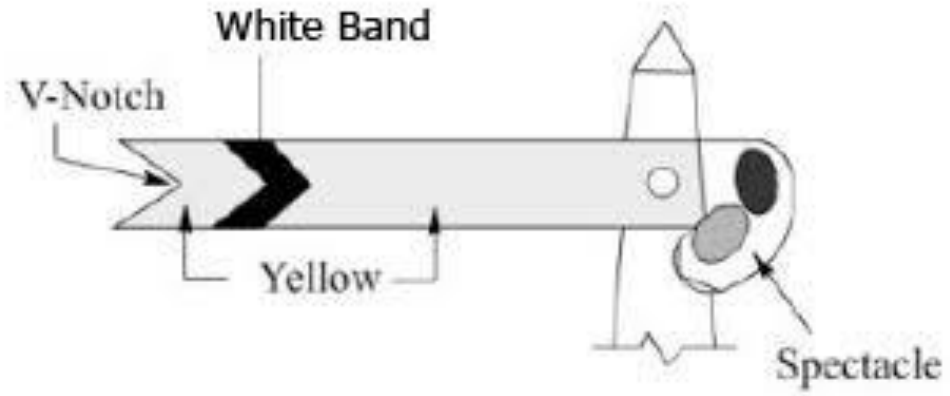

চিত্রঃ সতর্ককারী সিগনাল

সতর্ক সিগনাল এর দূরত্ব নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে-

(i) গাড়ির গতি
(ii) রেলের অবস্থা
(iii) ইঞ্জিনের ব্রেকের শক্তি
(iv) লাইনের ঢাল
(v) ব্রেকের দক্ষতা
(vi) সম্পূর্ণ ট্রেনের ওজন ইত্যাদির উপর।

(ii) ডিস্ক সিগনাল বা শান্টিং সিগনাল (Disk Signal):

এ ধরনের সিগনাল স্টেশন প্রাঙ্গণে শান্টিং এর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে সাদা রং এর একটি গোলাকার লোহার পাত ব্যবহার করা হয়। এর কেন্দ্র বরাবর একটি লাল কেন্দ্র টানা থাকে। গোলাকার পাতের মধ্যে একটি লাল এবং অপর একটি সবুজ গ্লাস লাগানো থাকে। যখন লাল বেন্ডটি সম্মিলিতভাবে থাকে তখন লাল আলো দেখা যায়। এতে সামনের দিকে এগুবার ইঙ্গিত দান করে না। যদি একে লিভারের সাহায্যে 45° কাত করা হয় তখন সবুজ আলো দেখা যায়। এটা সামনের দিকে এগুবার সংকেত দান করে।

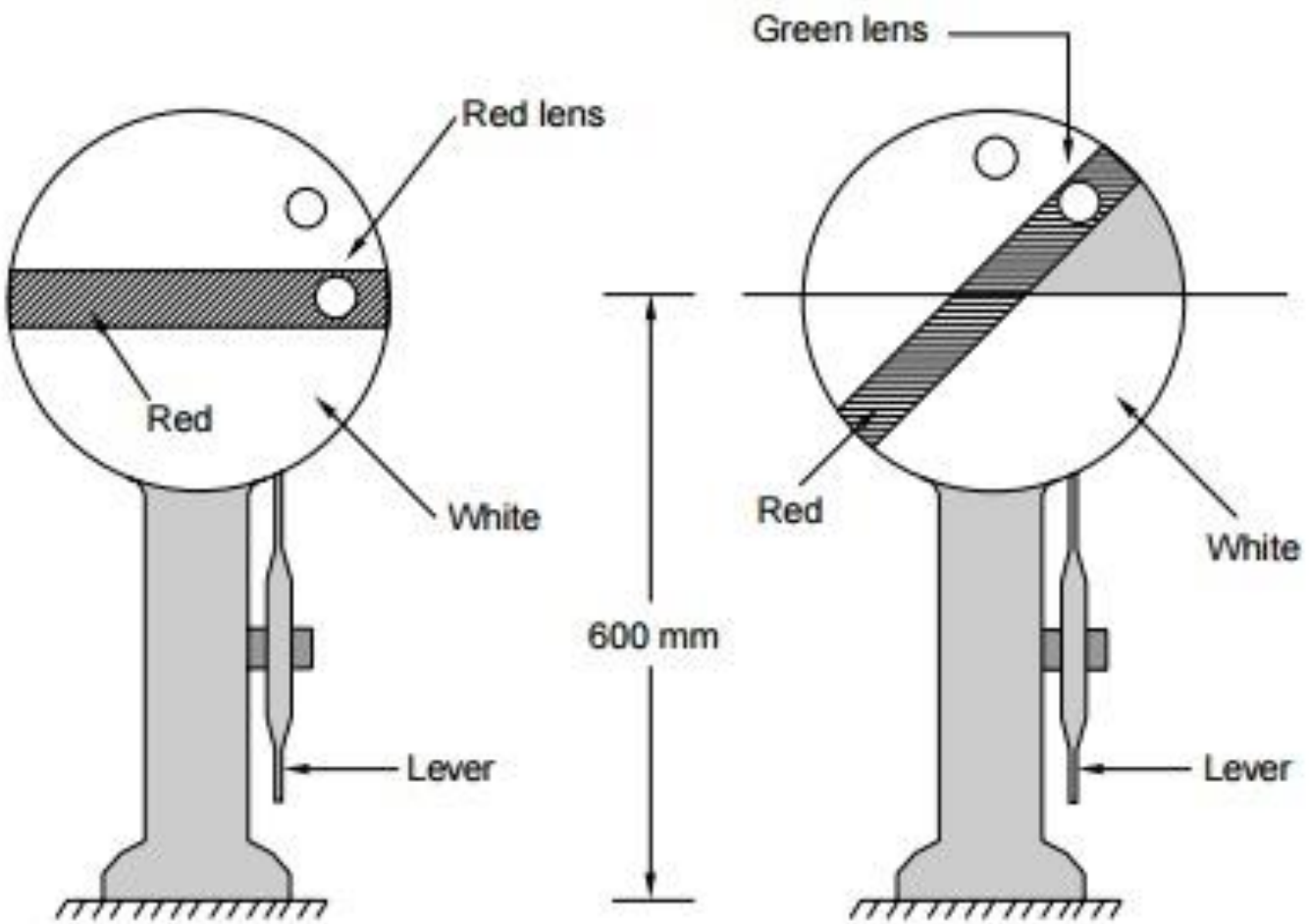

Fig. 31.8 Disc type of shunt signals

কালার লাইট সিগনাল (Coloured Light Signal):

বর্তমানে এ ধরনের সিগনাল এর প্রচলন খুব বেশি। বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে এই সিগনালে লাইটিং এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই সিগনালে তিনটি গ্লাস সম্বলিত ভাল্ড থাকে। উপরের গ্লাসটি সবুজ, মধ্যের গ্লাসটি হলুদ এবং নিচের গ্লাসটি লাল। যদি লাল বাতি জ্বলে তখন গাড়ি সামনের দিকে আগানো নিরাপদ নয়া। যদি সবুজ বাতি জ্বলে তাহলে ট্রেন সামনের দিকে আগানো পুরাপুরি নিরাপদ আর যদি হলুদ বাতি জ্বলে তাহলে সামনের দিকে আগানো যেতে পারে, তবে সতর্কতা অনুসারে।

চিত্রঃ কালার লাইট সিগনাল

ডিটোনেটিং সিগনাল (Ditonating Signal):

যেসব এলাকায় প্রচুর কুয়াশা পড়ে, বিশেষ করে রাতের বেলা সিগনাল দেওয়া সম্ভব নয়, সেসব এলাকায় এই সিগনাল ব্যবহার করা হয়। এই সিগনালে কিছু বিস্ফোরক পদার্থ লাইনের উপর দেওয়া হয় এবং গাড়ি চলাকালে চাকার ঘর্ষণে প্রচণ্ড শব্দ উৎপন্ন হয়। গাড়ি চলার সময় একটি শব্দ উৎপন্ন হওয়ার পর যদি আরো দুটি শব্দ পর পর উৎপন্ন হয় তবে গাড়ি সামনের দিকে আগানো নিরাপদ। তবে এই প্রকার সিগনাল নিরাপদ নয়।

৯.৩ ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রক
(Discuss the Control of Movements of Train):

একটি নির্দিষ্ট লাইনে ট্রেন চলাচলের জন্য তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি। নিরাপদে এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যে এক স্থান হতে অন্য স্থানে গাড়ি পৌঁছানোর জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রক বলে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(i) ফলোইং ট্রেন পদ্ধতি (Following Train System)
(ii) অ্যাবসলুট ব্লক পদ্ধতি (Absolute Block System)
(iii) অটোমেটিক সিগনালিং (Automatic Signalling)
(iv) পাইলট গার্ড পদ্ধতি (Pilot guard System).
(v) সেন্ট্রালাইজড ট্রাফিক কন্ট্রোল (Centralized Traffic Control System)

৯.৩.১ ফলোইং ট্রেন পদ্ধতি

(Describe the Following Train System)

এটি খুবই পুরাতন পদ্ধতি। তবে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন পদ্ধতি যখন খারাপ হয়ে যায়, তখন জরুরি ভিত্তিতে এই পদ্ধতিতে এখনো ট্রেন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে একই লাইনে দুটি ট্রেন চালনা করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রথম ট্রেনের পিছন থেকে অনুসরণকারী ট্রেনের মাথার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ দূরত্ব থাকতে হবে।

১.৩.২ সুষ্টু বিভাগ ব্যবস্থা (Describe the Absolute Block System):

ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ Signal প্রদান বর্তমানে বিভাগ ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যকরী। হয়। এই ব্যবস্থায় রেল সড়ক কতগুলো বিভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রতিবারে এক বিভাগে শুধুমাত্র একটি ট্রেন চলতে পারে। সাধারণত পাশাপাশি দুটি রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশকে একটি বিভাগ ধরা হয়।

এ পদ্ধতিটি স্পেস ইনটারভেল (Space Interval) সিস্টেম বা লক অ্যান্ড ব্লক (Lock & Block) সিস্টেম নামেও পরিচিত। এ পদ্ধতিটি বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পুরো রেলপথকে কতগুলো ব্লক সেকশন্স এ ভাগ করা হয়। সচরাচর পাশাপাশি দুই স্টেশনের দূরত্বই ব্লক সেকশন।

এ পদ্ধতিতে প্রতি স্টেশনে এক জোড়া ব্লক ইন্সট্রুমেন্ট স্থাপন করা হয়। এ ইন্সট্রুমেন্টে ব্লক সেকশনের কোন ট্রেন আছে কিনা জানা যায়। এ যন্ত্রটিকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যে, এতে কোন ব্লক সেকশনে কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি মাত্র ট্রেন থাকবে। ফলত স্টেশন মাস্টার কোন সেকশনে ট্রেনকে প্রবেশ করতে দিবে কিনা তা ব্লক ইন্সট্রুমেন্ট হতে সহজে জেনে নেয়। এ পদ্ধতিতে অনুমান করা হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী স্টেশন হতে ব্লক ইন্সট্রুমেন্ট 'লাইন মুক্ত' সংবাদ না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্লক সেকশন ব্লক অবস্থায় আছে। শাখা লাইনের ক্ষেত্রে ব্লক ইন্সট্রুমেন্টের পরিবর্তে টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ সংবাদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

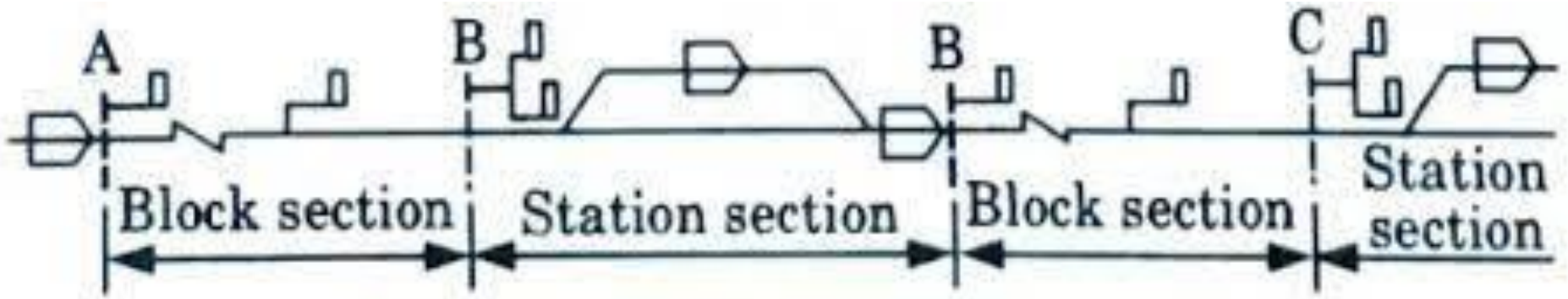

Fig. 3.5.1. Absolute block system.

চিত্রে A ও B সিগন্যাল বক্সের মাঝে ব্লক সেকশন AB। A স্টেশন হতে ট্রেন AB ব্লক সেকশনে প্রবেশ করা মাত্রই B ব্লক ইন্সট্রুমেন্টে ট্রেনের আগমন সিগন্যাল ধরা পড়ে। B তে ট্রেন না পৌঁছা পর্যন্ত A স্টেশন হতে অন্য কোন ট্রেন একই লাইনে ছাড়া হয় না। B স্টেশনের সিগন্যাল ম্যান যখন দেখে যে A স্টেশন হতে আগত ট্রেন B স্টেশনের সকল সিগন্যাল অতিক্রম করে B স্টেশন সেকশনে প্রবেশ করছে, তখন A স্টেশনের সিগন্যাল ম্যানের নিকট AB ব্লক সেকশন মুক্ত সংবাদ পাঠায় এবং A স্টেশন হতে পরবর্তী ট্রেন B স্টেশনের দিকে ছাড়া হয় এবং B এ সংবাদ দেয়া হয় যে লাইনে ট্রেন দেয়া হল, প্রস্তুত হও। B সংবাদ প্রাপ্তির পর পরবর্তী স্টেশন C কে সংবাদ দেয় এবং BC ব্লক সেকশনে ট্রেন প্রবেশের অনুমতি দেয়। এই ট্রেন C স্টেশন সেকশনে প্রবেশের পর এ সংবাদ B স্টেশনকে দেয়া হয়। এ নিয়মে একটি ব্লক সেকশনে একটির বেশি ট্রেন কখনও থাকে না।

৯.৪ পাইলট গার্ড সিস্টেম এবং সেন্ট্রালাইজ ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম বর্ণনা (Describe the Pilot Guard System and Centralize Traffic Control System):

৯.৪.১ পাইলট গার্ড সিস্টেম (Describe the Pilot Guard System):

এই পদ্ধতি শুধুমাত্র নিম্নলিখিত কারণে ব্যবহৃত হয়–

(১) কোন একক, লাইনে টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে।

(২) দুই লাইনের একটি ট্র্যাক কাজ না করলে।

এই পদ্ধতিতে একজন পাইলট গার্ড একটি ট্রেনে করে পরবর্তী স্টেশন পর্যন্ত যায় এবং তার ফিরে না আসা পর্যন্ত অন্য কোনে ট্রেনকে চলতে দেওয়া হয় না। পাইলট গার্ড আবার একইভাবে যাতায়াত করে এবং এই প্রক্রিয়া পুনঃপুন চলতে থাকে।

৯.৪.২ কেন্দ্রীয় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বর্ণনা (Describe Centralized Traffic Control System): এই পদ্ধতিতে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে সিগনাল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখানে সিগনাল কেবিন এর প্রয়োজন থাকে না। পয়েন্ট এবং সিগনালসমূহ ইন্টারলক করা থাকে এবং ট্রেনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ডায়াগ্রাম তৈরি করে নেয়া হয়। এটিকে সংক্ষেপে সিটিসি (ctc) পদ্ধতি বলে এবং এটি সর্বপ্রথম জুলাই, 1927 সালে আমেরিকায় স্ট্যানলি (stanley) থেকে বারউইক (Berwick) পর্যন্ত 64-37 কি. মি. রাস্তায় প্রয়োগ করা হয়।

এই পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণকারী সময় পণ্যবাহী এবং যাত্রীবাহী ট্রেনের ওভারটেকিং এবং ক্রসিং নিয়ন্ত্রণ করে। এই পদ্ধতিতে ট্রেনের ড্রাইভারদের নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তার সংকেত অবশ্যই মেনে চলতে হয়। CTC পদ্ধতিতে ট্রেনের সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। এর পরও যদি কোনে। ড্রাইভার সিগনাল উপেক্ষা করে এগিয়ে যায় তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে থামার নির্দেশ আসে এবং ট্রেনটিকে থামানো হয়। CTC পদ্ধতির ব্যয়ভার কতগুলো বিষয় যেমন- ট্রেন চলাচলের পদ্ধতি ট্রাফিকের পরিমাণ, সিগনাল পরিবর্তন, লাইনের পার্শ্বের জায়গার পরিমাণ, লাইনের সংখ্যার উপর, স্থানের উপর নির্ভর করে।

এই পদ্ধতির সুবিধাসমূহ:

(i) একক লাইনের জন্য এটি সর্বোত্তম পদ্ধতি।

(ii) নিয়ন্ত্রণকারী পূর্বেই ট্রেনের গতিবিধি নির্ধারণ করে অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ করতে পারে।

(iii) লাইনের ত্রুটি যেমন- ভেঙে যাওয়া লাইন সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

(iv) পয়েন্ট এবং সিগনাল পুশ বাটনের মাধ্যমে 30 সেকেন্ডেই পরিচালনা করা যায়।

(v) যেহেতু ড্রাইভারকে সিগনাল নিজ চোখে দেখে ট্রেন চালাতে হয় না সেহেতু অনুমোদিত সর্বোচ্চ মাত্রায় ট্রেনটি চালানে যায়। থামার সিগনাল হলে ড্রাইভারের কক্ষেই লাল বাতি জ্বলে ওঠে অথবা জোরে ভেপু বেজে ওঠে। যদি তারপরও। ড্রাইভার না থামায় তবে ট্রেনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই থেমে যায়।

৯.৫ স্বয়ংক্রিয় সিগনালিং বর্ণনা (Describe Automatic Signalling):

মানুষ অসতর্কতার ফলে সৃষ্ট দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য স্বয়ংক্রিয় সিগনালের আবির্ভাব। এই পদ্ধতিতে ট্রেনসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ট্রেনটি যে লাইনে চলে সেই লাইনে বৈদ্যুতিক প্রবাহই সিগনাল (সংকেত) দেয় এবং ট্রেনটি নিরাপদ স্থানে না পৌছানো পর্যন্ত সংকেত দিতে থাকে। বৈদ্যুতিক প্রবাহ ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ (Locomotive) ওভার হেড লাইন অথবা তৃতীয় রেল এর মাধ্যমে প্রবাহিত করা হয়। ওভার হেড লাইনের মাধ্যমে প্রবাহিত করার পদ্ধতিকে ক্যাটিনারি সিস্টেম (Catinary System) বলে এবং তৃতীয় রেল অর্থাৎ পুনঃ স্থাপনযোগ্য কালেকটিং ডিভাইস এর মধ্যে প্রবাহিত করাকে প্যানটোগ্রাফ (Pantograph) বলে।

প্যানটোগ্রাফ পদ্ধতিতে রেল লাইনের বাইরের পার্শ্ব দিয়ে ধাতব সু (Shoe) জোড়া লাগানো থাকে এবং এর ভিতর দিয়েই বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালনা করা হয়। আমেরিকানরা আরো উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করে। লোকোমোটিভ এর হুইল ব্রেক এর সাথেই উপযুক্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সংযুক্ত থাকে এবং চালক যদি বিপদ না বুঝাতে পারে তবে ব্রেকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সক্রিয় হয়। তবে সিগনাল অফ (off) থাকলে ব্রেক স্বয়ংক্রিয় থাকে না।

স্বয়ংক্রিয় সিগনাল ব্যবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহের জন্য।

(i) সিগনাল ম্যান কম লাগে ফলে চালনা ব্যয় কম।
(ii) মানবিক ভুলত্রুটি এড়ানো যায় বলে নিরাপদ বেশি।
(iii) লাইন ব্লক থাকলে বা আবার উন্মুক্ত হলে সাথে সাথেই জানা যায় ফলে সময় অপচয় কম হয় এবং একই কারণে লোকোমোটিভ বা বাহনের সংখ্যা কম লাগে।
(iv) সিগনাল বক্স বা এই জাতীয় উপাদান কম লাগে বিধায় খরচও কমে।
(v) যদি কোন কারণে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সমস্ত স্থানেই বিপদ সংকেত জ্বলে ওঠে ফলে মারত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না তবে এক্ষেত্রে একটু সময় বেশি লাগে এবং ট্রেনগুলো থেমে থাকে।

এ সিগন্যালিং সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

(ক) অটোমেটিকভাবে চালিত স্টপ সিগন্যালের দ্বারা ট্রেনের চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়।

(খ) লাইন ক্লিয়ার থাকা ছাড়া কোন সিগন্যালই 'অফ' হয় না। সিগন্যাল সামনে থাকা কালে এর সামনে নিরাপদে থামার পর্যাপ্ত দূরত্ব থাকবে।

(গ) ট্র্যাকের পুরো দৈর্ঘ্য কতগুলো অটোমেটিক সিগন্যালিং সেকশনে ভাগ করা থাকবে এবং প্রত্যেকটি সেকশনই স্টপ সিগন্যালের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৯.৫ ইন্টারলকিং বা পারস্পরিক বন্ধন (State the Meaning of Interlocking):

ট্রেন চলাচল নিরাপদ করার জন্য বহু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এমন স্টেশন আছে যেখানে প্রতিনিয়ত বহু ট্রেন আগমন নির্গমন করে এর জন্য নির্ভুলভাবে প্রত্যেক ট্রেনের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এবং এদের জন্য স্থান সংস্থান করে চলাচলের নির্দেশ দিতে হয়। এর জন্য প্রধান প্রধান লাইনের সঙ্গে এক বা একাধিক পার্শ্বে লাইনের সংযোগ স্থাপিত করা হয়ে থাকে। এসব কাজ সাধারণত জটিল এবং একাধিক লোক বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। নানা ধরনের ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে যান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রমের ভুলের সম্ভাবনাকে দৃঢ় করা হয়। যেসব যান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় তাকে পারস্পরিক বন্ধন বা ইন্টারলকিং বলে।

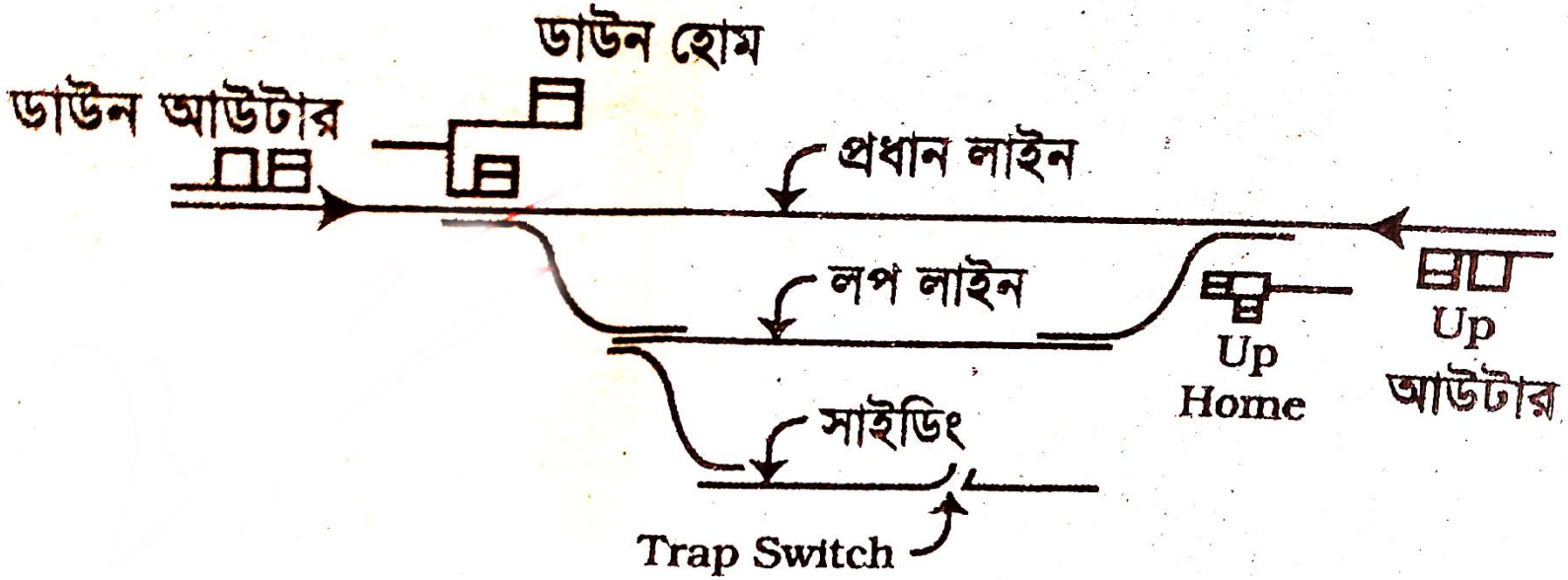

চিত্র- ৯.১০ : Interlocking System

৯.৭.১ পারস্পরিক বন্ধনের পদ্ধতি (Describe the Methods of Interlocking)

পয়েন্ট ও সিগন্যাল কতগুলো লিভারের সাহায্যে পরিচালনা করা হয়। এগুলো ভূমি সমতলে বা প্লাটফর্মের সমতলে বা এ উদ্দেশ্যে নিচুতে নির্মিত কাঠামোর সমতলে থাকতে পারে। লিভারগুলোকে বিশেষ ব্যবস্থায় রাখার কাঠামোর নাম সিগন্যাল বক্স বা সিগন্যাল কেবিন। কেবিন ম্যানের কাজের সুবিধার্থে সিগন্যাল কেবিনে লিভারগুলোর পিছনের দেয়ালে লিভারগুলোর (টেবিল) পরিচিতি চিত্র ঝুলানো থাকে। তবে আজকাল কেবিন ম্যানের সহজ ব্যবহারের সুবিধার্থে পৃথক পৃথক ধরনের লিভারে ভিন্ন ভিন্ন রং দেয়া থাকে। সচরাচর লিভারে নিম্নের রংগুলো ব্যবহৃত হয়।

লিভারের পরিচিতি	রং
পয়েন্টের লিভার	কালো
লকের লিভার	নীল
স্টপ লিভার	লাল
ওয়ার্নার লিভার	সবুজ
গেট ক্রসিং এর জন্য লিভার	হলুদ
স্পেয়ার লিভার	সাদা

সাধারণত 760 সেমি হতে 910 সেমি দূরত্বে খুঁটি বসিয়ে খুটির মাথায় মাটি হতে কমপক্ষে 10 সেমি উপরে ফুলি লাগিয়ে তার বসিয়ে সিগন্যাল পয়েন্ট ও লিভারের মধ্যে সংযোগ দেয়া হয়। তিনটি পদ্ধতিতে পারস্পরিক বন্ধন সৃষ্টি করা হয়। যথা–

(1) ট্যাংপেট ও লক পদ্ধতি (Tappets and Lock System)

(2) চাবি পদ্ধতি (Key System)

(3) কট রিলে পদ্ধতি (Route Relay System)

(1) ট্যাপেট ও শক পদ্ধতি (Tappets and Lock System): গতিজনিত সংমর্থ প্রতিরোধ করার জন্য এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ট্যাপটগুলো স্টিলের তৈরি এবং এর আকার সাধারণত ১৪ মি.মি. 16 ছি.নি হয়ে থাকে। ট্যাপেটগুলোতে ডি-আকারে খাঁজ কাটা হয়। লকগুলোও স্টিলের তৈরি এবং এগুলোতে এমনভাবে খাঁজ কাটা থাকে যেন সহজেই ট্যাপেটের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। লকগুলো ট্যাপেটের সাথে সমকোণে চলাচল করে।

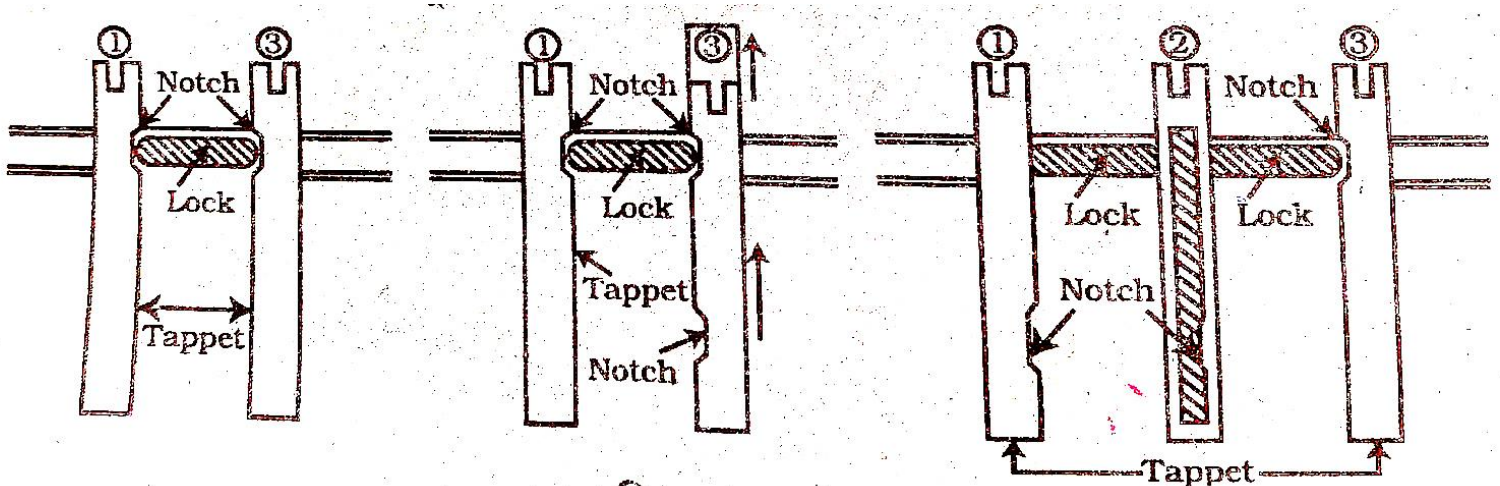
①
③
Notch
Lock
Tappet
①
③
Notch
Lock
Tappet
Notch
①
②
③
Notch
Lock
Lock
Notch
Tappet

চিত্র- ৯.১১ :

(i) **চাবি পদ্ধতি (Key System):** ইন্টারলকিং পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এই পদ্ধতি খুবই সহজ। ও সরল। এই পদ্ধতিকে কখনো কখনো ইনডাইরেক্ট, ইন্টারলকিং বলে। এই পদ্ধতি দুই প্রকার। যথা–

(1) একক চাবি পদ্ধতি (Signal Key System)

(2) ডাবল চাবি পদ্ধতি (Double Key System)

(ক) সিঙ্গেল লক অ্যান্ড কী সিস্টেম: এ পদ্ধতিতে দুটি লকের সাথে একটি কী কাজ করে। এতে কী লকটি অপসারণ করলে সিগন্যাল অনুভূমিক অবস্থায় চলে আসে এবং পয়েন্ট প্রধান লাইনের সাথে স্বাতাবিক অবস্থানে থাকে। নিম্নে সিঙ্গেল লক অ্যান্ড কী সিস্টেমটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপন করা হলো।

এ সিস্টেমটি একটি প্রধান লাইন ও একটি সাইডিং এর জন্য P ও Q দুটি লক একটি কী এর সাহায্যে চালনা করা হয়। এখন লকে কী প্রবেশ করিয়ে ঘুরালে সিগন্যাল নেমে যাবে। সিগন্যাল নামানো থাকা অবস্থায় লক হতে কী বের করা সম্ভব নয়। এ সময় পয়েন্ট সঠিকভাবে প্রধান লাইনের সাথে পাতানো থাকবে। একইভাবে যদি সাইডিং ব্যবহার করতে হয় তবে সিগন্যাল স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে Q লক হতে চাবি বের করে P লকে চাবি প্রবেশ করিয়ে ঘুরালে পয়েন্ট সাইডিং এর সাথে মিলে যাবে এবং প্রধান লাইনের সিগন্যাল নামানো সম্ভব হবে না।

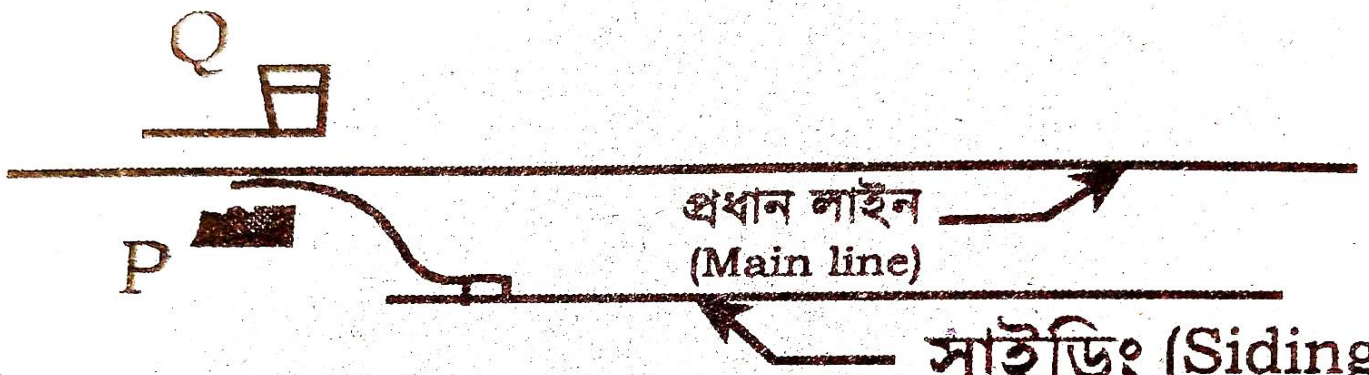

চিত্র- ৯.১২ : সিঙ্গেল ব্লক এন্ড কী সিস্টেম

খ) ডাবল লক অ্যান্ড কী সিস্টেম: নিম্নে ডাবল লক অ্যান্ড কী সিস্টেমটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপন করা হল। ধরা যাক, প্রধান লাইনের সিগন্যাল P পয়েন্ট এবং R ট্র্যাপ পয়েন্টকে ইন্টারলক করতে হবে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধান লাইনের সিগন্যাল অনুভূমিক, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধান লাইনের পয়েন্ট ও ট্র্যাপ পয়েন্ট খোলা অবস্থায় থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় তে এক সেট, P তে ডাবল একসেট এবং R তে একসেট লক মোট তিন সেট লক থাকে। P এর ডাবল লকের দুটি কম্পার্টমেন্ট Q ও R এর লকের মতই। Q ও R এ যথাক্রমে K_1 ও K_2 দুটি কী। স্বাভাবিক অবস্থায় K_2 'কী' টি ডাবল লকের R কম্পার্টমেন্টকে ধরে রাখে।

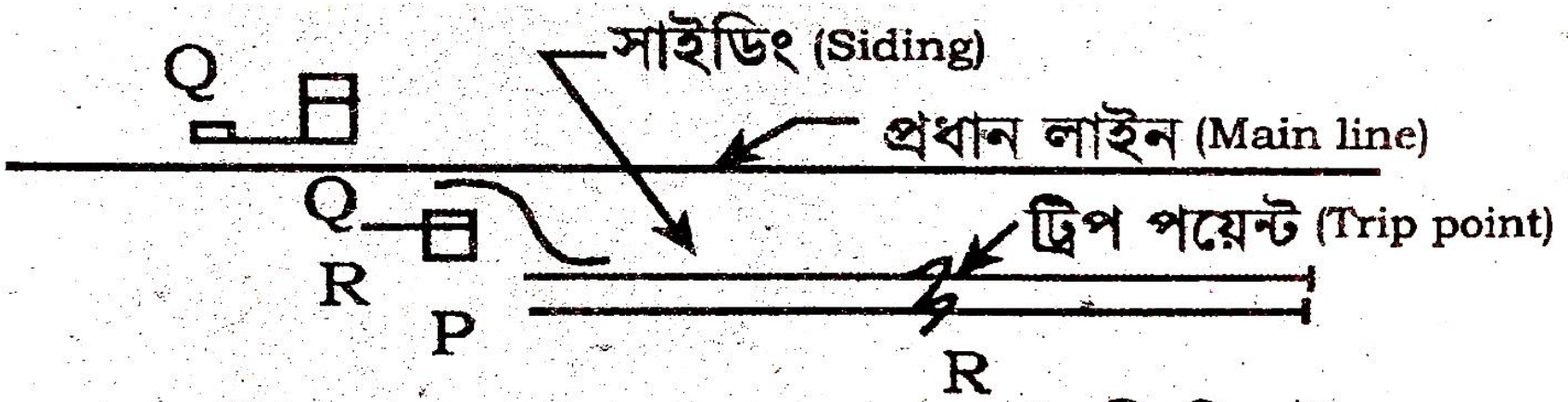

চিত্র- ৯.১৩ : ডাবল লক অ্যান্ড কী সিস্টেম

এখন Q লকে KI কে প্রবেশ করিয়ে ঘুরালে প্রধান লাইনের সিগন্যাল নেমে যাবে। এ অবস্থায় 'কী' লকে আটকে যাবে। যখন K_1 কী লকে এবং ডাবল লকের R কম্পার্টমেন্টে K_2 'কী' প্রবেশ করা থাকবে তখন কোনভাবেই সাইডিং এর পয়েন্ট পেতে দেয়া সম্ভব হবে না। যদি সাইডিং এ পয়েন্ট পেতে দিতে হয় তবে প্রথমে প্রধান লাইনের সিগন্যাল স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে হবে এবং K, 'কী' টি Q লক হতে বের করে নিতে হবে। এরপর P ডাবল লকের কম্পার্টমেন্টে K_1 'কী' টি প্রবেশ করিয়ে ঘুরালে পয়েন্টগুলো মুক্ত হয়ে সাইডিং এর সাথে মিশে যাবে। এরপর ডাবল লকের R লকে K_2 'কী' স্থাপন করে ঘুরালে ট্র্যাপ পয়েন্ট আবদ্ধ অবস্থানে চলে আসবে। উপরোক্ত 'কী' গুলো স্টেশন মাস্টারের নিকট সংরক্ষিত থাকে এবং এ 'কী' গুলোর মাধ্যমে কী অ্যান্ড লক সিস্টেম। কার্যকরভাবে সিগন্যাল, পয়েন্ট, ক্রসিং, লেভেল ক্রসিং, গেট ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। এ 'কী' গুলোর কার্যকরী ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘর্ষ ঘটতে পারে এমন দু'টি সিগন্যালকে একই সময়ে কোনভাবে নামানো যাবে না।

(iii) রুট রিলে পদ্ধতি (Route Relay System): এই পদ্ধতিতে ট্রেন চলাচলের জন্য পয়েন্ট ও সিগনালকে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় পরিচালনা করা হয়। বোতামসহ একটি প্যানেলকে কেবিনের মধ্যে রেখে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইন্টারলকিং পদ্ধতির মধ্যে এই পদ্ধতিটিই সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নততর। এই পদ্ধতিতে শ্রমশক্তির সাশ্রয় হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম পড়ে। রুট রিলে পদ্ধতির নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ রয়েছে–

(i) খুবই ব্যস্ত স্টেশনে অত্যন্ত কম সময়ে দ্রুত গতিতে ও নিরাপদে ট্রেনকে তার গন্তব্যে চলে যেতে সহায়তা করে।
(ii) অপারেশনের সময়ক্ষেপণ কমিয়ে আনা।
(iii) এই সিগনালিং থেকে ড্রাইভার উচ্চ আত্মবিশ্বাসী
হয় এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়া ঘটায়। (iv) কেবিন থেকে সুচারুভাবে ট্রেনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

দশম অধ্যায়

রেলওয়ে ব্রিজ, কালভার্ট এবং টানেলিং পথের বৈশিষ্ট্য

১০.০ সেতু ও কালভার্ট (Define Bridge and Culvert): সাধারণভাবে গভীর জলাশয়ের উপর দিয়ে যানবাহন ও পদযাত্রী পারাপারের জন্য যে কাঠামো নির্মাণ করা হয়, তাকে সের (bridge) বলে। কিন্তু সেতু প্রকৌশলীদের মতে, কোনো সড়ক বা রেলপথ কোনো প্রতিবন্ধকের (অন্য কোনো সড়ক বা রেলপথ, নদ-নদী, স্রোতস্বিনী ইত্যাদি) দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রতিবন্ধকের কোনোরূপ বিঘ্ন না ঘটিয়ে এর উপর দিয়ে যানবাহন, পদযাত্রী ইত্যাদি পারাপারের পথ হিসেবে যে কাঠামো নির্মাণ করা হয়, তাকে সেতু (Bridge) বলা হয়। অপরদিকে সড়কের আড়াআড়ি পানি নিষ্কাশন এবং যানবাহন, পদযাত্রী ইত্যাদি পারাপারের জন্য অগভীর খাল, 'স্রোতস্বিনী, নালা ইত্যাদির উপর নির্মিত কাঠামোকে কালভার্ট (Culvert) বলা হয়। নিম্নে সেতু ও কালভার্টের মধ্যকার প্রভেদগুলো উদ্ধৃত করা হলো।

সেতু ও কালভার্টের পার্থক্য:

সেতু	কালভার্ট
(i) নদী, গভীর জলাশয়, বড় খাল ইত্যাদির উপর নির্ণয় করা হয়।	(i) সড়কের আড়াআড়ি পানি নিষ্কাশনের অগভীর নালা খাল ইত্যাদির উপর নির্ণয় করা হয়।
(ii) বিস্তর তথ্য সংগ্রহ ও ভিত্তির জন্য মৃত্তিকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, নদীর গতিপথ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক তথ্য অনুসন্ধান করতে হয়।	(ii) সাধারণ তথ্যাবলির উপর নির্ভর করা যায়।
(iii) গভীর কোন জলাশয় যেমন নদী বা বড় খালের উপর নির্মিত কাঠামো, যার উপর দিয়ে নিরাপদে ভারি যানবাহন চলাচল করতে পারে।	(iii) সড়কের আড়াআড়ি ভূপৃষ্ঠস্থ পানি নিষ্কাশন বা ছোট অগভীর খালের উপর নির্মিত কাঠামো, যার উপর দিয়ে হাকলা যানবাহন চলাচল করতে পারে।
(iv) এর নিচ দিয়ে নৌযান চলাচল করতে পারে।	(iv) এর নিচ দিয়ে নৌযান চলাচল করতে পারে না।
(v) স্প্যান সাধারত 6 মিটারের অধিক ।	(v) স্প্যান সাধারত 6 মিটারের কম।

১০.১ রেলওয়ে ব্রীজ, কালবার্ট ও টানেলের বিভিন্ন অংশ সমূহ বর্ণণা

(Describe the Major Components of a Railway Bridge, Culvert and Tunnel):

সেতুর কাঠামোকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(i) সাব-স্ট্রাকচার (Sub-Structure)
(ii) সুপার-স্ট্রাকচার (Super Structure)

(1) **সাব–স্ট্রাকচার (Sub-Structure):** সুপার স্ট্রাকচারের লোডকে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। সাব– স্ট্রাকচার নিম্নলিখিত অংশের সমন্বয় গঠিত–

(i) পায়ার (Peirs)
(ii) এবার্টমেন্ট (Aburtments)
(iii) উইং ওয়াল (Wing wall)
(iv) এপ্রোচ (Approaches)
(v) রিভার ট্রেনিং ওয়ার্কস (River Training works)
(vi) ভিত্তি (Foundation)

(1) পায়ার (Peirs):

একাধিক স্প্যানবিশিষ্ট সেতুর মধ্যবর্তী খাড়া পিলার বা সাপোর্টকে পায়ার বলে। পায়ারের উচ্চতা এবার্টমেন্টের সমান বা কিছুটা অধিক হয়ে থাকে। পায়ার সাধারণত ম্যাসনরি বা আরসিসি তে তৈরি করা হয়ে থাকে। চিত্র: ১০.১ এ পায়ারের পার্শ্ব দৃশ্য এবং লম্বালম্বি দৃশ্য এবং চিত্র: ১০.২ এ বিভিন্ন আকৃতির পায়ারের প্রস্থচ্ছেদের চিত্র দেখানো হলো।

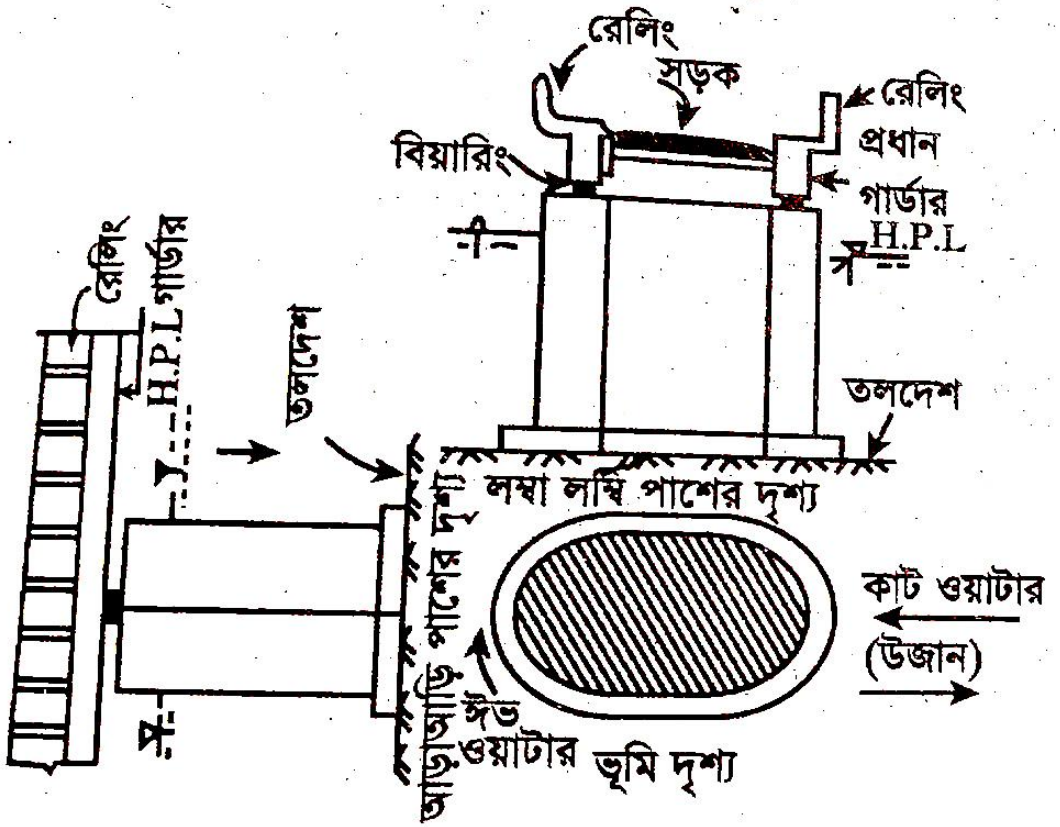
রেলিং
সড়ক
রেলিং
প্রধান
গার্ডার
বিয়ারিং
H.P.L
তলদেশ
তলদেশ
লম্বা লম্বি পাশের দৃশ্য
কাট ওয়াটার
(উজান)
ওয়াটার
ভূমি দৃশ্য

চিত্র- ১০.১ :

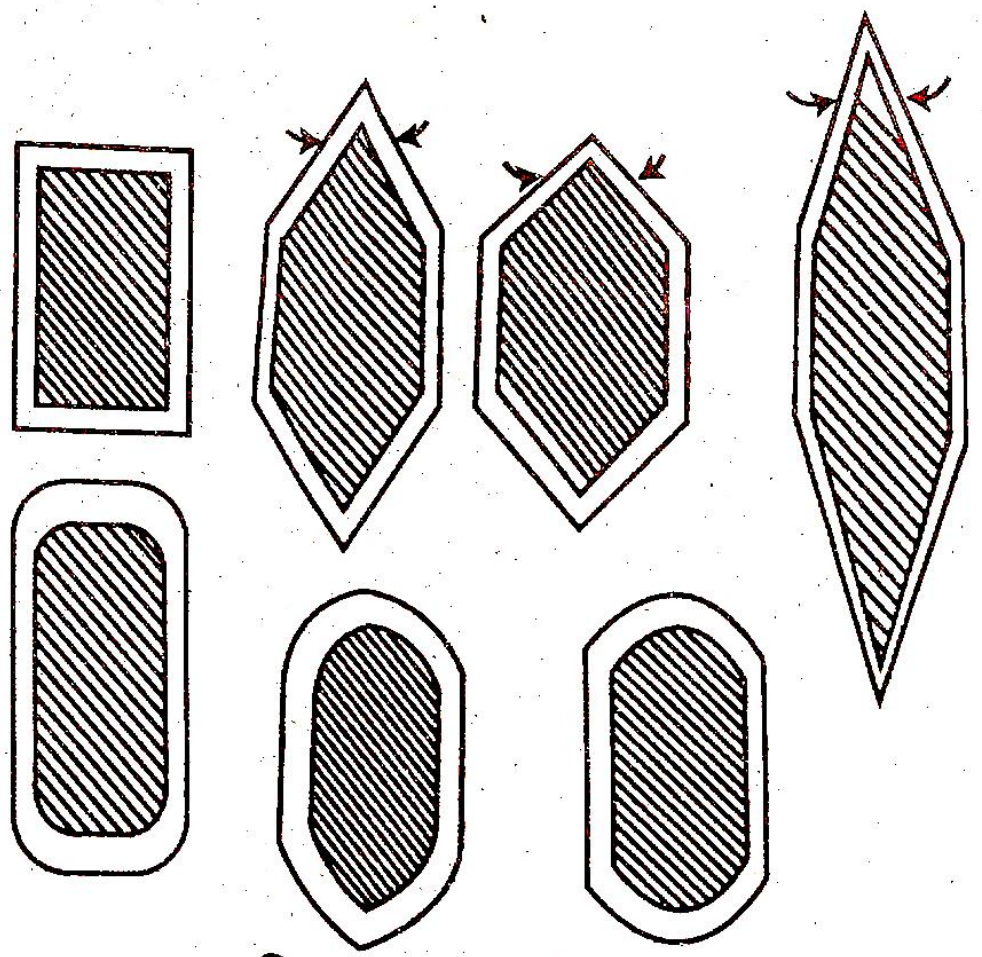

চিত্র- ১০.২ : বিভিন্ন আকৃতির পায়ার

(ii) এবার্টমেন্ট (Aburtments):

সেতুর দুই প্রান্তের দুটি খাড়া পিলার বা সাপোর্টকে এবার্টমেন্ট বলে। অথবা নদী বা জলপথের তীরদ্বয় সংযোগকারী কালভার্ট বা সেতু প্রান্তকে এবার্টমেন্ট বলে। ভেন্টহীন কজওয়ে ও পাইপ ড্রেন ব্যতীত সকল ধরনের এবার্টমেন্ট থাকে। চিত্র ১০.৩ এ ম্যাসনরি আর্চ সেতুর, চিত্র: ১০.৪ আরসিসি আর্চ সেতুর, চিত্র: ১০.৫ এ আরসিসি বীম সেতুর এবার্টমেন্ট এবং চিত্র: ১০.৬ এ বিভিন্ন আকৃতির এবার্টমেন্টের প্রস্থচ্ছেদের চিত্র দেখানো হলো।

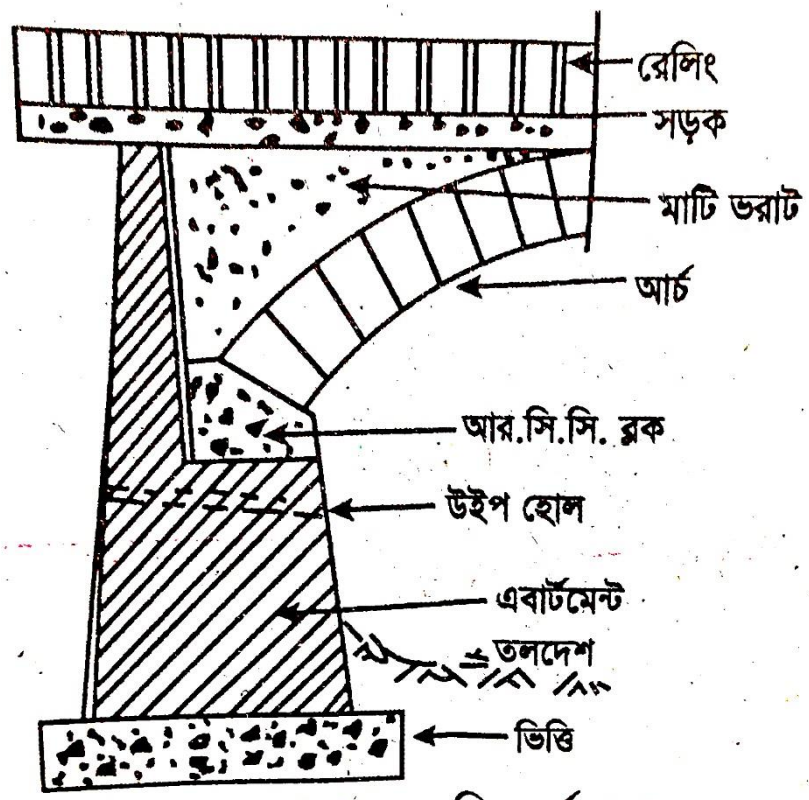

চিত্র- ১০.৩ : ম্যাসনরি আর্চ সেতু

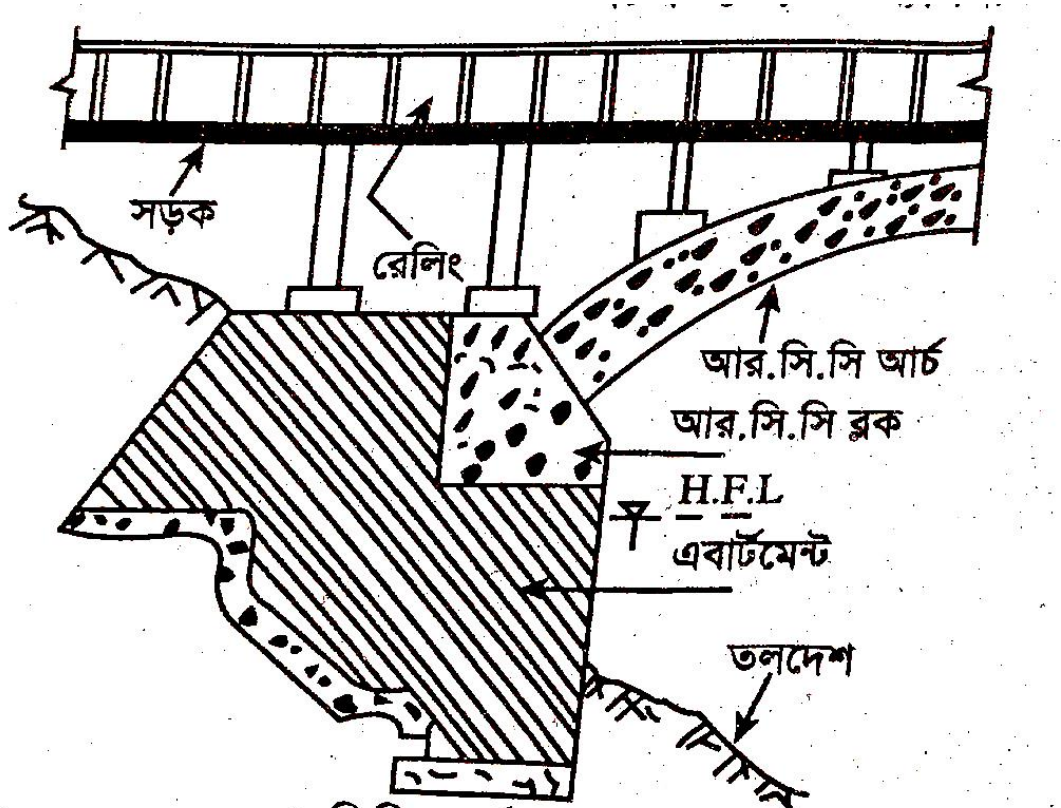

চিত্র- ১০.৪ : আরসিসি আর্চ সেতু

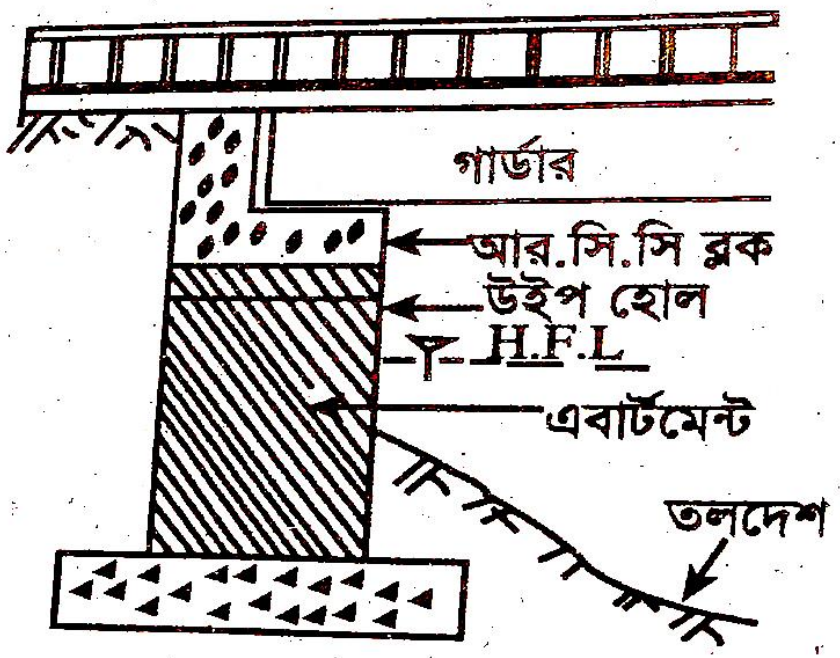

চিত্র- ১০.৫ : আরসিসি বীম সেতু

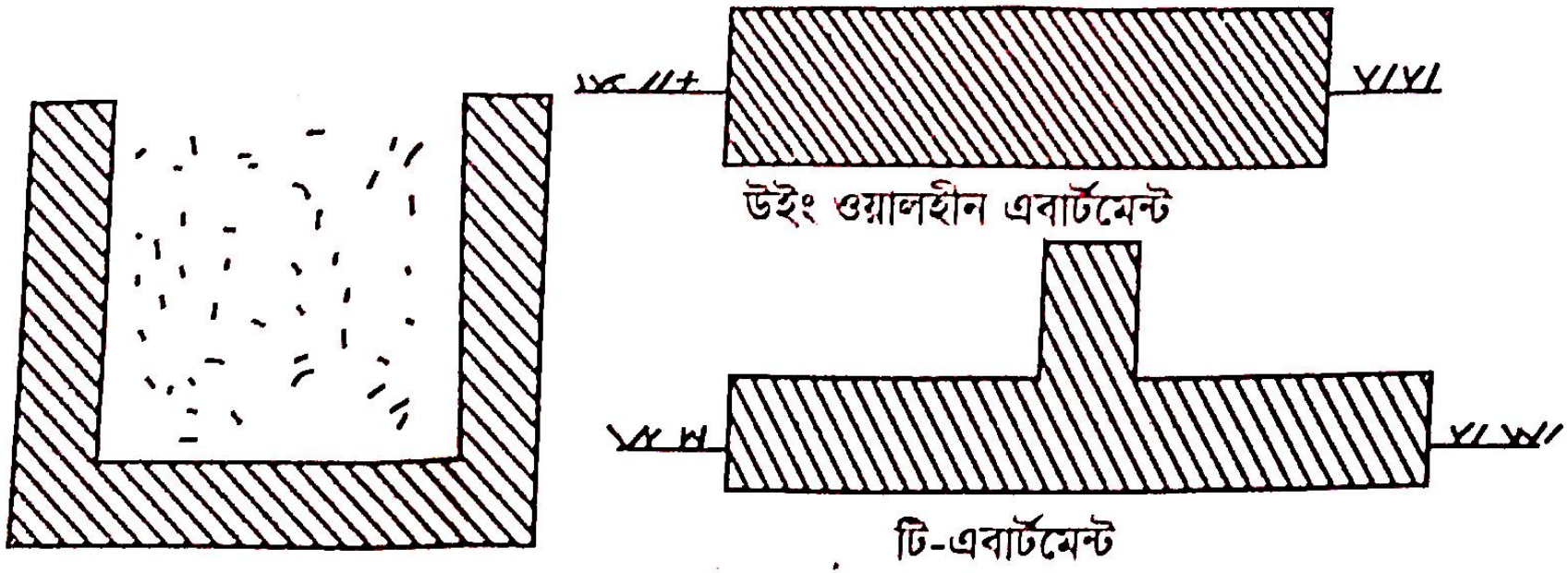

চিত্র- ১০.৬ : বিভিন্ন আকৃতির এবার্টমেন্টের ভূমি দৃশ্য

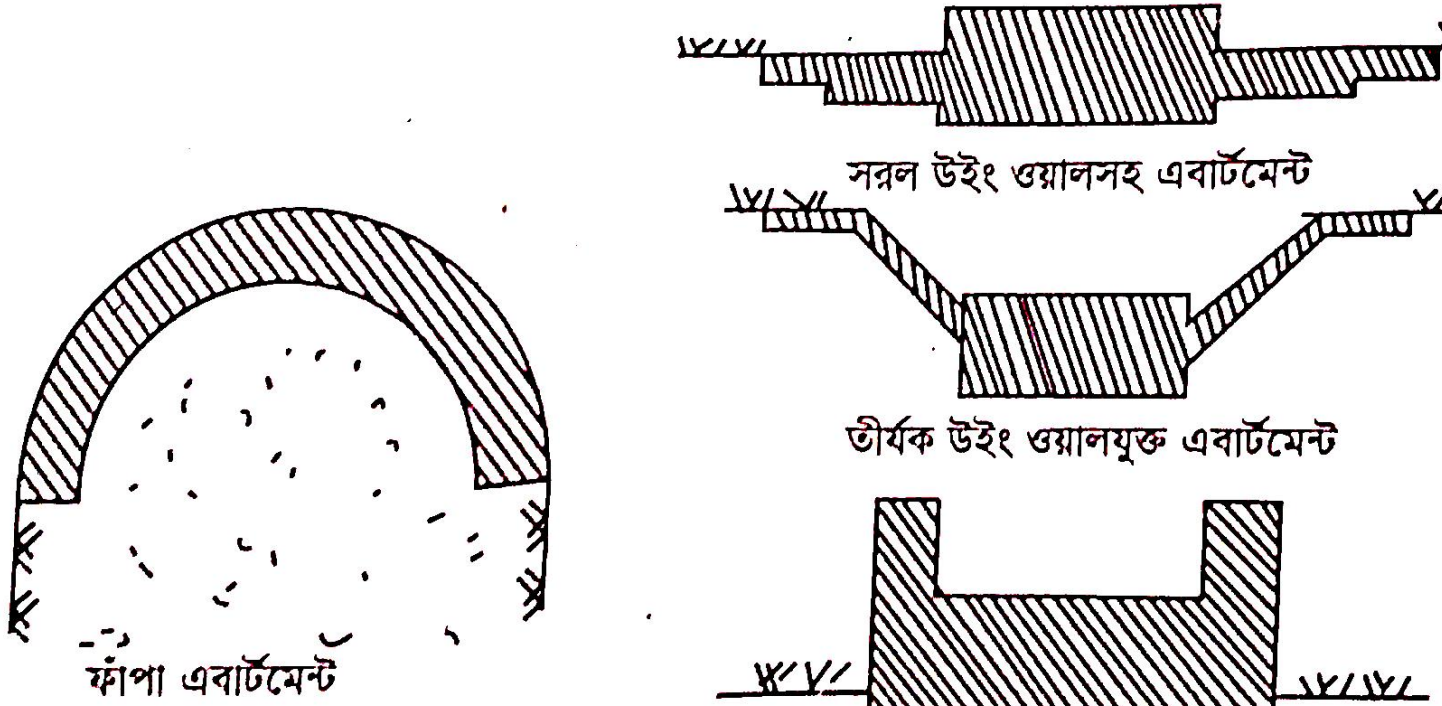

চিত্র- ১০.৬ : বিভিন্ন আকৃতির এবার্টমেন্টের ভূমি দৃশ্য

(iii) উইং ওয়াল (Wing Wall):

এবাটমেন্টের পিছনের রাস্তার অংশকে আটকে রাখার জন্য যে কাঠামো নির্মাণ করা হয় তাকে উইং ওয়াল বলে। উপরের চিত্রে বিভিন্ন ধরনের উইং ওয়ালের চিত্র দেখানো হয়েছে।

(iv) এপ্রোচ (Approaches):

সড়ক বা রেলপথের যে অংশ মূল সেতুর সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে এপ্রোচ বলে। এপ্রোচ ভূমিতে বা নদীর অংশে হতে পারে। চিত্র-১০.৭ তে এপ্রোচ দেখানো হলো:

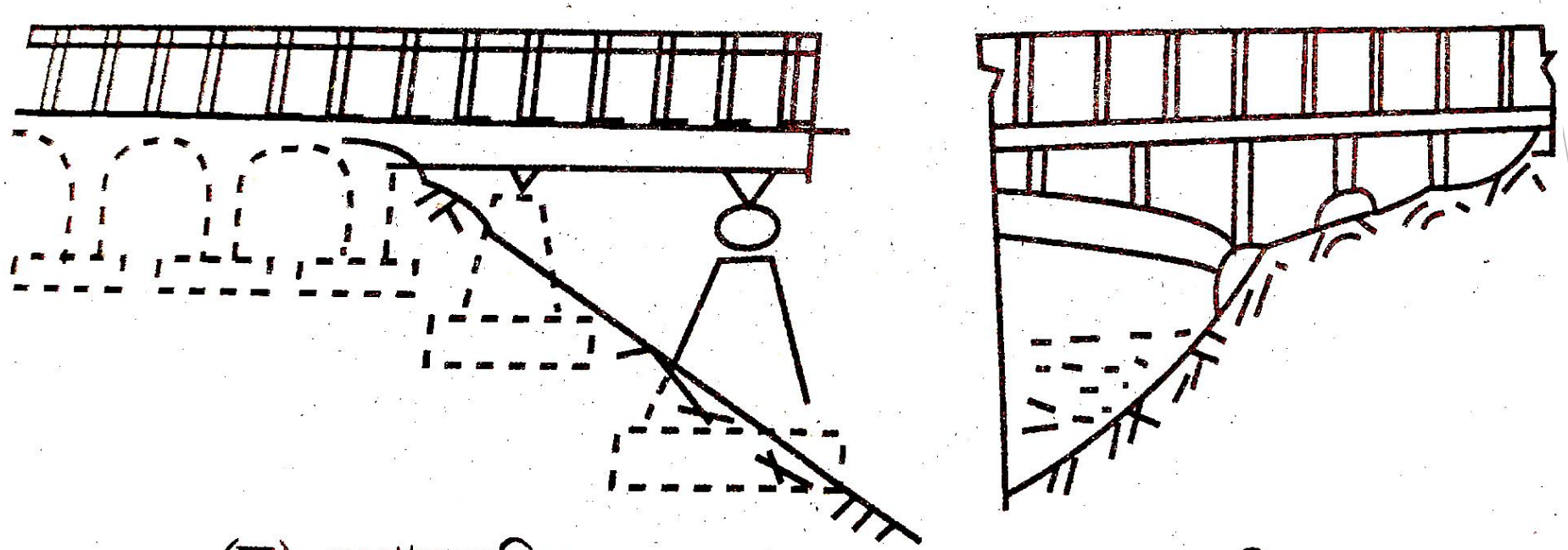

(ক) এপ্রোচ ভূমিতে

(খ) এপ্রোচ নদীতে

চিত্র- ১০.৭ :

(v) রিভার ট্রেনিং ওয়ার্কস (River Training Works): নদীর অপ্রতিরোধ্য গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেসব কাঠামো নির্মাণ করা হয় তাকে রিভার ট্রেনিং ওয়ার্কস বা নদী নিয়ন্ত্রণ কাজ বলে।

(vi) ভিত্তি (Foundation): কাঠামোর সর্বনিম্ন অথেকে ভিত্তি বলে। এর ডিজাইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং করুন।১৯১ সাধারণত ব্যাফট ভিত্তি, পাইল ভিত্তি, ফ্যাশন ভিত্তি, ওয়েল ভিত্তি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সেতুতে সাধারণত ব্যাফসা হতে (চিত্র ১০.৮)। পাইল ভিত্তি (১০.৯), ক্যাশন ভিত্তি (চিত্র ১০.১০), ওয়েল দিতি (চিত্র ১০.১১) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

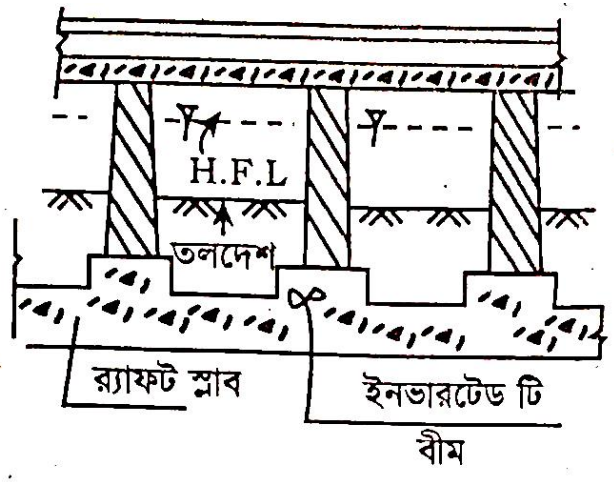

চিত্র- ১০.৮ : র‍্যাফট ভিত্তি

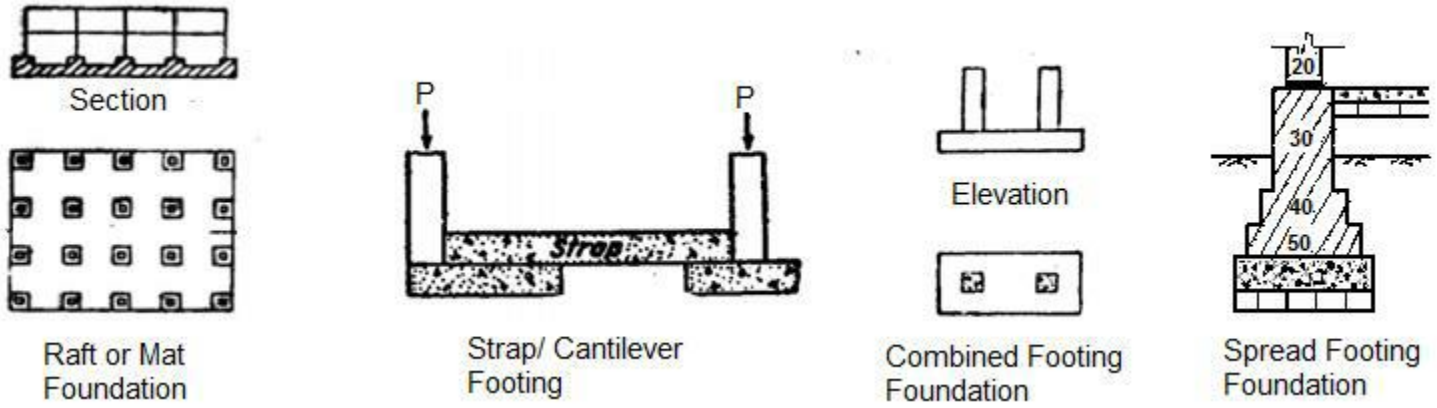

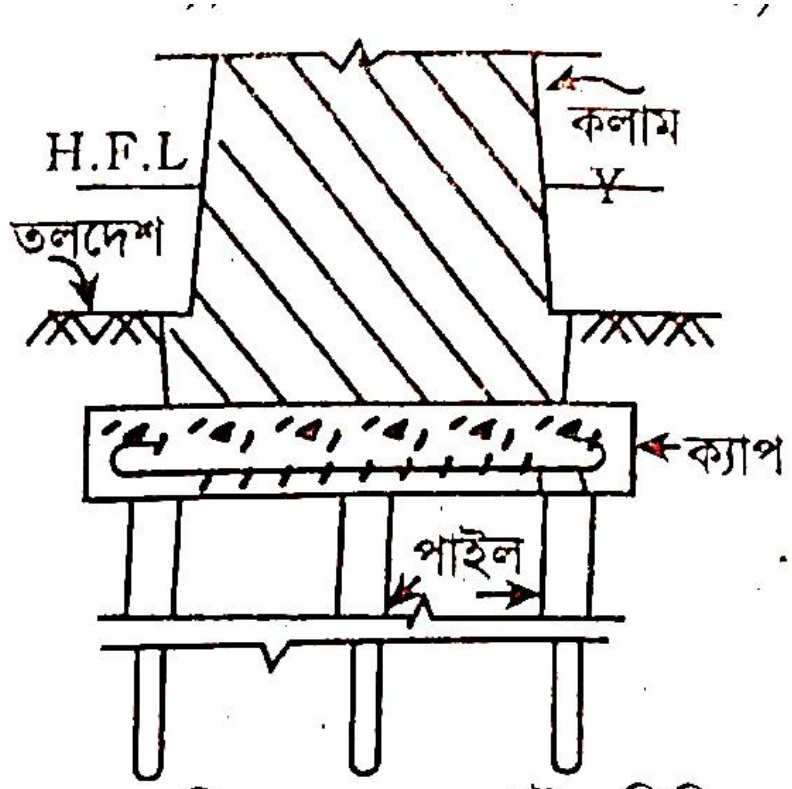

চিত্র- ১০.৯ : পাইল ভিত্তি

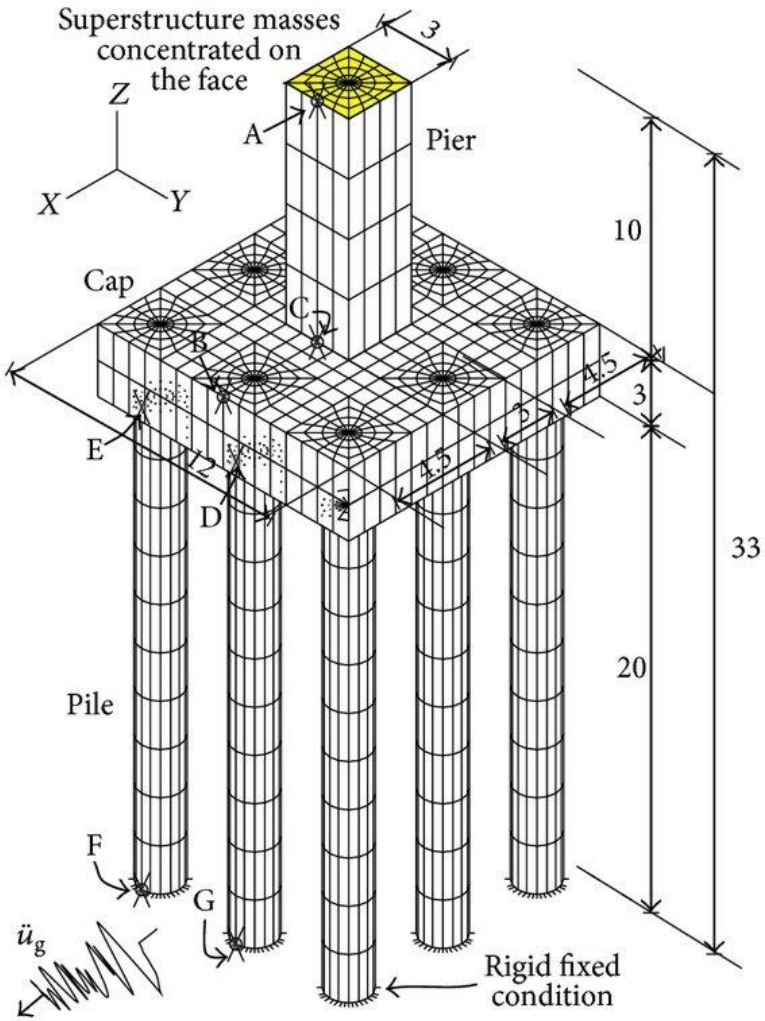

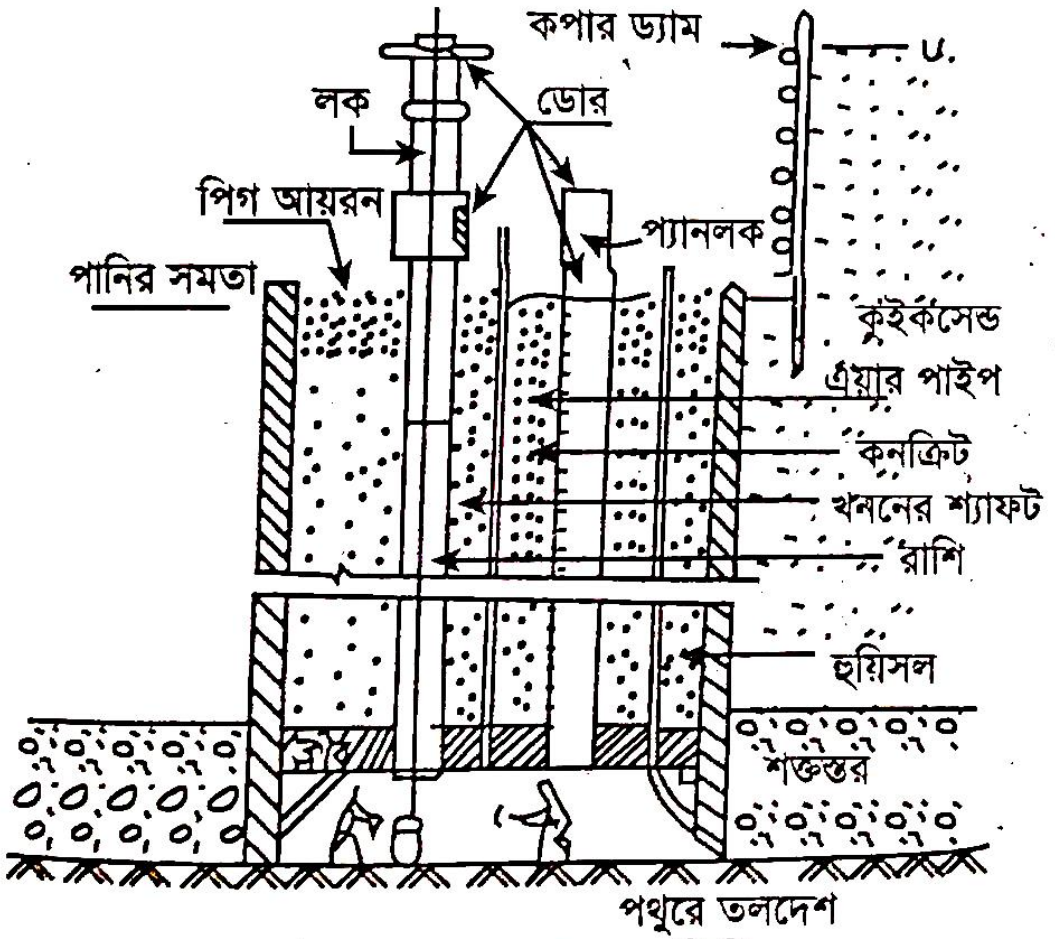

চিত্র- ১০.১০ : ক্যাশন ভিত্তি

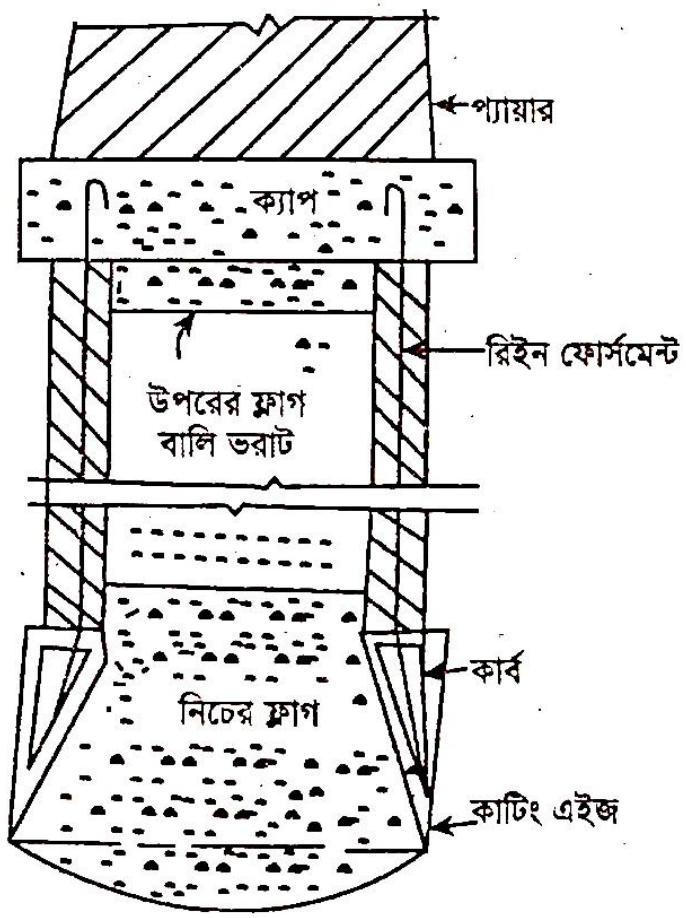

চিত্র- ১০.১১ : ওয়েল ভিত্তি

(২) সুপার স্ট্রাকচার (Super Structure): এটা ব্রিজের অংশ যার উপর ট্রাফিক নিরাপদে চলাচল করতে পারে। প্যারাপেট, রোডওয়ে, গার্ডার, আর্চ বা ট্রাস ইত্যাদি দ্বারা সুপার স্ট্রাকচার গঠিত হয়।

১০.১১ টানেল (সুড়ঙ্গ) (Define Tunnel):

ট্রেন, গ্যাস পয়ঃনিষ্কাশন, পানি, খনিজদ্রব্য আবর্জনা যাত্রী ইত্যাদি পরিবহনের জন্য ভূগর্ভে যে পথ তৈরি করা হয় তাকে টানেল বা সুড়ঙ্গ বলে। এ সুড়ঙ্গ পথ পাহাড় ভেদ করে নদীর তলার মাটির নিচ দিয়ে স্বাভাবিক ভূপৃষ্ঠের নিচ দিয়ে নির্মিত হতে পারে।

১০.৪ ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণে বিবেচ্য বিষয়াদি (Mention the Points to be Considered in Locating the Site for a Railway Bridge and Culvert):

রেল সেতুর নির্মাণের পূর্বেই সেতুর জন্য একটি উপযোগী স্থান নির্বাচন করতে হয়। এ উপযোগী স্থান নির্বাচন সেতুর প্রয়োজনীয়তা, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যানবাহনের পরিমাণ, নদী বা স্রোতস্বীনির বৈশিষ্ট্য, ভূনিম্নস্থ মাটির অবস্থা ও গুণাগুণ, প্রকল্পের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ, সেতুর জন্য বিকল্প স্থান ও এর সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রক ভূমিকা পালন করে। নিম্নে সেতু নির্মাণের জন্য আদর্শ স্থানের বৈশিষ্ট্যগুলো দেয়া হলো।

(i) নদী বা জলস্রোতের সোজা অংশে: উজানে ও ভাটিতে পর্যাপ্ত সোজা দৈর্ঘ্য রেখে সেতুর অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে। এতে সেতু অংশে নদীতে সুষম প্রবাহ থাকবে, পাড় ও তলদেশের ক্ষয় কম হবে এবং প্রবাহে ঘূর্ণনের সৃষ্টি হবে না।

(ii) **উপযোগী ভিত্তি:** সেতুর স্থান এমন স্থানে নির্ধারণ করতে হবে যেন ঐ স্থানের মৃত্তিকা ভৌগোলিক দিক হতে নিখুঁত, ফল্ট জোন (Fault Zone) হতে দূরে, এবাটমেন্ট ও পায়ারের ভিত্তির উপযোগী এবং মাটির ক্ষয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকে। কোন স্থান সকল দিকের বিবেচনায় সেতুর জন্য উপযোগী হলেও শুধুমাত্র ভিত্তি অনুপযোগী হলে তা নির্বাচন করা যাবে না ।

(iii) **দৃঢ় ও স্থায়ী পাড়:** যেখানে নদীর পাড় স্থায়ী ও দৃঢ় ঐ স্থানে সেতুর অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।

(iv) **ঘূর্ণি স্রোতামুক্ত ও প্রবাহ বেগ:** নদীর যে অংশে স্বাভাবিক প্রবাহ বিদ্যমান এবং ঘূর্ণি প্রবাহের সম্ভাবনা থাকে না, ঐ স্থানে সেতুর স্থান নির্ধারণ করতে হবে। অনুমোদিত প্রবাহ বেগের চেয়ে অধিক প্রবাহ বেগের স্থানে সেতুর অবস্থান নির্ধারণ করা যাবে না।

(v) সেতুর দৈর্ঘ্য ও বন্যাসীমা: যে স্থানে নদী বা জলাশয় সংকীর্ণ এবং পাড়ের উচ্চতা সর্বোচ্চ বন্যাসীমা হতে উপযোগী উচ্চতায় অবস্থান করে, ঐ স্থানে সেতুর দৈর্ঘ্য ন্যূনতম হবে। এরূপ স্থানে সেতুর অবস্থান নির্ধারণ করা উচিত।

(vi) এপ্রোচ সড়ক: এপ্রোচ সড়ক নির্মাণে সাশ্রয়ী, এপ্রোচ প্রতিবন্ধকতামুক্ত (পাহাড় ইত্যাদি মুক্ত) ও গুণ অসন্তোষের কারণমুক্ত, এপ্রোচ নির্মাণে কম পরিমাণ জমি হুকুম দখলে আনতে হয়, এরূপ স্থানে সেতুর স্থান নির্ধারণ করা শ্রেয়।

(vii) সড়কের সাথে একই সরল এলাইনমেন্ট: সেতুর স্থান এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যেন সেতু মূল সড়কের এলাইমেন্টের সাথে মোটামুটি সরল রেখায় অবস্থান নেয়। পানি স্রোতের সাথে সেতুর অবস্থান সমকোণে নির্ধারণ করাই উত্তম।

(viii) এপ্রোচ বাঁক: সেতুর এপ্রোচ সড়কে কম ব্যাসার্ধের বাঁক (Sharp Curve) দেয়া যাবে না।

(ix) নদ-নদী নিয়ন্ত্রণ কাজ: সেতুর স্থান নির্ধারণে সতর্কতার সাথে অধিক ব্যয়ের নদ-নদী নিয়ন্ত্রণ কার্য করার ঝুঁকি পরিহার করে সেতুর স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

(x)পানি নিম্নস্থ নির্মাণ: যথাসম্ভব ন্যূনতম পানি নিম্নস্থ নির্মাণের উপযোগী স্থানে সেতুর অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।

(xi) স্পিল জোন: স্পিল জোনের যথাসম্ভব দূরে ভাটির দিকে সেতুর অবস্থান নির্ধারণ করাই উত্তম। যেহেতু সেতুর জন্য আদর্শ স্থান নির্ধারণ সত্যিকার অর্থে দুষ্কর। তাই যে ক্ষেত্রে সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ ও সেতুর নিরাপত্তার জন্য হুমকি না থাকে ঐ স্থানেই সেতু নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করাই যুক্তিযুক্ত।

১০.৫ রেলওয়ে টানেল-এর উদ্দেশ্য এবং উন্নয়ন উল্লেখ (Mention the Purpose and Development of Railway Tunnels):

১০.৫.১ টানেল-এর উদ্দেশ্য (Mention the Purpose of Tunnels):

নিম্নে টানেল তৈরির উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো:

(i) টানেল তৈরি এর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো নিরাপদেও দ্রুততার সাথে যাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা করা।

(ii) শহরের পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য টানেল ব্যবহৃত হয়।

(iii) টানেলের মাধ্যমে বিশাল পাহাড় বা নদী সহজেই দ্রুততার সাথে পারাপার হওয়া যায়।

(iv) শহরের পানি সরবরাহের কাজেও টানেল ব্যবহৃত হয়।

(v) টানেলের মাধ্যমে যাতায়াতে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে।

(vi) দ্রুততার সাথে মালামাল পরিবহনের মাধ্যমে টানেল নদী বা পাহাড় এর উভয় পাশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে।

(vii) খনি থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য আহরণের জন্য টানেল ব্যবহার করা হয়।

১০.৭ পাতাল ও আকাশ রেলপথের সুবিধা

Mention the Advantages of Underground Railways and Overhead Railway)

১০.৭.১ পাতাল রেলপথের সুবিধা (Advantages of Underground Railways):

যানবাহনের ক্রমাগত অস্বাভাবিক ভিড়ের জন্য পাতাল রেলপথ নির্মাণের ধারণা আসে। কারণ কোলাহলপূর্ণ সড়ক যানবাহনের "চেয়ে পাতাল রেলপথে ভ্রমণ অধিক আরামদায়ক। ভূপৃষ্ঠের কিছু নিচ দিয়ে নির্মিত স্বল্প দৈর্ঘের্ঘ্যর পথের পাতাল রেলপথ (Underground railway) বলা হয়। এই ধরনের রেলপথ সেই সমস্ত স্থানে নির্মাণ করা হয়। যেখানে গভীর সুড়ঙ্গ তৈরি করা যায়। পাতাল রেলপথের জন্য কাটা এবং ঢাকা পদ্ধতি (Cut an cover method) ব্যবহার করা হয়। পাতাল বা ভূগর্ভস্থ রেলপথের সুবিধা নিম্নরূপ:

(i) শহরের কেন্দ্র হতে বাইরের দিকে জনসাধারণ পরিবহনে এটা সহায়তা করে। ফলে শহরের রাস্তা বড় করার প্রয়োজন হয় না। এমনকি শহরকে যানজট হওয়া থেকেও অনেকটা রক্ষা করে।
(ii) এটি মধ্যবিত্ত এরং শ্রমিক শ্রেণির লোকদের শহরতলি এলাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসের সুযোগ করে দেয় এবং তারা মোটামুটি সপ্তাতেই শহরে প্রতিদিন যাতায়াত করতে পারে।
(iii) শ্রমিকদের আবাসিক এলাকা থেকে কর্মস্থলে যাতায়াতের সুব্যবস্থা করে দেয়।
(iv) সিজন টিকেটধারী অথবা যারা নিয়মিত যাতায়াতকারী স্বাচ্ছন্দ্যে দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত করতে পারে।
(v) এতে শব্দ ও বায়ু দূষণের সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে।
(vi) পাতাল রেলপথে ভাড়া কম।

একাশদ অধ্যায়
রেল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ধারণা

১১.০ হায়ী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ'। স্থায়ী সড়কে অবিরত ট্রেন চলাচলের ফলে বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি দেখা যায়। এসব ত্রুটি মেরামতকে *হরী সড়ক সংরক্ষণ নামে অভিহিত করা যায়। রেল লাইনে রেলগাড়ির চলাচল ও অন্যান্য কারণে (যেমন- যথাযথ পানি নিষ্কাশনের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার ইত্যাদি) বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়। এ সকল ত্রুটি মেরামত করে ট্রাককে নিরাপদ ও সচল রাখার ব্যবস্থাকে রক্ষণাবেক্ষণ বলা হয়ে থাকে। রেল সড়কে সৃষ্ট ত্রুটিগুলোর মধ্যে প্রস্তুতি তলের ত্রুটি, রেলের এলাইনমেন্টগত ও সামগ্রীগত বা নির্মাণ উপকরণগত ত্রুটির প্রতি রক্ষণাবেক্ষণ কালে বিশেষভাবে লক্ষ্য দিতে হয়।

১১.১ বেল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনীয়তা (Explain Necessity for Maintenance Work in Railway):

স্থায়ী সড়ক স্থাপন করার পর নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। এই রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ঠিকমতো না করলে বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি দেখা দেয়। যেমন–

(i) পাত্রের ত্রুটি (Surface defect),
(ii) রেখাভুক্তির ত্রুটি (Alignment defect),
(iii) সড়কে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের ত্রুটি।

এসব ত্রুটিসমূহ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূর করার প্রয়োজন হয়। অন্যথায় এর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে ফলে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় এবং পরিশেষে দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিম্নলিখিত কারণে সড়ক সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়।

(i) দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করে ট্রেন চলাচলের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য।
(ii) সড়কের স্থায়িত্বের বৃদ্ধি করার জন্য।
(iii) সড়ক পথে গৃহীত মালামাল সুবিধাজনকভাবে এবং নিরাপদে পরিবহন করার জন্য।
(iv) এক দ্রুত ট্রেন চলাচলের জন্য।
(v) পয়েন্ট এবং ক্রসিং সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য।
(vi) ট্রেন চলাচলের খরচ কমানোর জন্য।
(vii) ট্রেন ভ্রমণ সহজ ও আরামদায়ক করার জন্য।
(viii) স্থায়ী সড়ক হতে পানি নিষ্কাশনের জন্য।

রেল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কারণ (Reasons for Maintening the Track): নিম্নলিখিত দুটি প্রধান কারণের জন্য যথাযথভাবে রেল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।

(১) নতুন ট্রাক (New Track),

(২) অবিরত ব্যবহার (Constant Use)

(১) নতুন ট্র্যাক (New Track): নতুনভাবে স্থাপিত রেল লাইন আস্তে আস্তে বসে যায়। এ ধরনের ত্রুটি দূর করার জন্য বিশেষ এক দল লোক নিয়োগ করা থাকে, যারা লাইনের অসমবসনকে দ্রুততার সাথে ফরমেশন লেভেলে ফিরিয়ে আনে। এ উদ্দেশ্যে সাধারণত প্রতি কিলোমিটার সড়ক মেরামতের 4 জনের একটি দল নিয়োগ করা থাকে। তবে এই সংখ্যা কাজের ধরনের উপর নির্ভর করে।।

(২) অবিরত ব্যবহার (Constant Use): রেলের উপর দিয়ে অবিরত ট্রেন চলাচলের ফলে রেলে নানা ধরনের ত্রুটি দেখা দেয়। এসব ত্রুটিকে মেরামত করে লাইনকে ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য এক দল সংরক্ষণকর্মীকে রেলওয়ে ট্রাকে নিয়োজিত থাকে। এ দলের মূল কাজ হলো, রেল লাইনকে সবসময়ে ব্যবহার উপযোগী রাখা। এ কারণে রেল লাইনকে 5 হতে 6 কিলোমিটার করে একটি সেকশনে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতি সেকশনের জন্য একটি গ্যাংকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই গ্যাংয়ের লোকসংখ্যা কত হবে তা ট্রাফিকের ঘনত্ব, মাটির প্রকৃতি ও স্থায়ী সড়কের শক্তির উপর নির্ভরশীল।

১১.২ রেল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা
(Mention the Advantages of Good Track Maintenance) :

স্থায়ী সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা নিম্নরূপ–

(i) উত্তম রক্ষণা–বেক্ষণ স্থায়ী সড়কের এবং রুলিং স্টকের আয়ু বৃদ্ধি করে।
(ii) স্থায়ী সড়কের ট্রেনের দ্রুত গতিবেগ অক্ষুন্ন রাখতে পারে।
(iii) অপারেটিং খরচ কম হয় ফলে যানবাহনে জ্বালানি খরচ কমে যায়।
(iv) গুরুত্বপূর্ণ মালামাল সুবিধাজনকভাবে এবং নিরাপদে পরিবহন করা যায়।
(v) ট্রেন ভ্রমণ সহজ ও আরামদায়ক হয়।
(vi) ট্রেনের লাইনচ্যুতি ও দুর্ঘটনার হার সন্তোষজনকভাবে কমিয়ে আনে।
(vii) রেলগাড়ি দ্রুত নিরাপদে চলাচল করতে পারে।

১১.৩রক্ষণাবেক্ষণ কাজে গ্যাংমেট, কী-ম্যান এবং পারমানেন্ট ওয়ে ইনস্পেপেক্টর (পিডব্লিউআই) কর্তব্য বর্ণনা Describe the Duties of Gang Mate, Key Man and Permanent way Inspector (PWI) in the Maintenance Work):

(ক) দলপতি বা গ্যাংমেট এর কর্তব্য (Dutiesofa Gangmate):

দলপতির কর্তব্যগুলো নিম্নরূপ-

(i) একটি গ্যাং-এর দায়িত্বে যে থাকে তাকে গ্যাংমেট বা সর্দার বলে। সড়কের কোনো নির্দিষ্ট এলাকার নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ করা গ্যাংমেটের দায়িত্ব।

(ii) দলপতির দায়িত্ব তার নির্দিষ্ট এলাকা সবসময়ই গাড়ি চলাচলের জন্য উপযোগী রাখা।

(iii) সড়কের এলাইনমেন্ট ও লেভেল ঠিক রাখা।

(iv) সড়কের সঠিক গেজ মাপ বজায় রাখা।

(v) পয়েন্ট এবং ক্রসিং নির্দিষ্ট সময় অন্তর চেক ও পরীক্ষা করা।

(vi) টেলিফোন ও সিগনালের তারে কোনো প্রকার ত্রুটি আছে কিনা তা লক্ষ্য করা।

(vii) সময়মতো পুরাতন মালামাল বদলিয়ে নতুন মাল লাগানোর জন্য কোনো বিশেষ সুবিধাজনক স্থানে মালামাল জমা রাখা।

(viii) যদি সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে, তবে দলপতি দ্রুততার সাথে ঐ স্থান পরিদর্শন করে রেলের ভাঙা ফিটিংসগুলো তত্ত্বাবধান করবেন এবং ঘটনাবলি রেকর্ড করবেন।

(ix) দলপতি তার এলাকার পয়েন্ট ক্রসিং এবং লেভেল ক্রসিং এর সংখ্যা ও অবস্থানের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করবেন।

(x) দলপতি সড়কে নির্মিত ব্রিজের সর্বোচ্চ বন্যাতল সিগনালে বাধাপ্রাপ্ত গাছের শাখা, সড়ক, পুনঃনির্মাণ প্রভৃতি দেখাশুনা করবেন।

(xi) সর্দার তার নিজের অংশের লাইন পরিদর্শন করবেন। লাইনে চলাচলের সময় পতাকা এবং বিস্ফোরক পদার্থ তার সাথে থাকবে। লাইনের কোনো অংশে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে পতাকার সাহায্যে ট্রেনকে থামাবেন। বৃষ্টি মেঘাচ্ছন্ন এবং কুয়াশার দিনের জন্য বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করে ট্রেনের চালককে সংকেত দান করে।
(xii) দলপতি রেলের ভূমি জমি অবৈধভাবে দখলকারীকে প্রতিরোধ ও রেলওয়ে সীমানায় গবাদিপশু বিচরণে বাধা প্রদান করবেন। এছাড়া তার নির্দিষ্ট এলকায় অবৈধ নির্মাণ কাজের রিপোর্ট করবেন।

(খ) কী-ম্যানের কর্তব্য (Duties of a Keyman):

কী-ম্যানের কর্তব্যগুলো নিম্নরূপ-

(i) গ্যাংমেটের অধঃস্তন ব্যক্তি ফী-ম্যান । তাই গ্যাংমেটের অনুপস্থিতিতে তার সকল দায়দায়িত্ব কী-ম্যান পালন করেন, যেমন- গেজ মাপ ঠিক রাখা, সড়কের বিভিন্ন উপকরণ যথাস্থানে আছে কিনা দেখা এবং ঠিক রাখা।

(ii) সকল ফ্যাসেনিং এবং জয়েন্ট সংরক্ষণ করা কী-ম্যানের দায়িত্ব)। সে প্রতিদিন তার নির্ধারিত এলাকায় ফ্যাসেনিং ও জয়েন্টসমূহ পরিদর্শন করবে। সর্বদায় তার সাথে 1টি হাতুড়ি, ১টি রেঞ্চ, 2টি লাল ফ্ল্যাগ, ১টি সবুজ ফ্ল্যাগ ও ৪টি ডিটোনেটর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় টুলস রাখবেন। বৃষ্টি বা অন্যান্য কোনো অসুবিধা মোকাবিলা করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করবেন।

(iii) কী-ম্যান সড়ক পরিদর্শনের যদি ইঞ্জিন টুলস, যাত্রীদের দ্রব্যাদি, ডায়নামোবেল্ট ইত্যাদি লাইনে পেলে তা সংগ্রহ করে নিকটবর্তী স্টেশন মাস্টারের নিকট হস্তান্তর করবেন।

(iv) গার্ডবিহীন রেল ক্রফিং এ কী-ম্যান গার্ডরেল ও রানিং রেলের মধ্যে ফ্ল্যাঞ্জ ওয়েকে পরিষ্কার রাখবেন।

(v) রেল, ফিসপ্লেট ইত্যাদি ভেঙে গেলে বা ব্যালাস্ট সরে গেলে তিনি তা নিয়মিত পরিদর্শন কালে লিপিবদ্ধ করবেন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। এছাড়া দ্রুত লাইন মেরামতের ব্যবস্থা নিবেন।

(vi) প্রতি বছর কমপক্ষে একবার সকল জয়েন্ট খুলে পরীক্ষা করবেন এবং পুনরায় লাগাবেন।

(গ) পারমানেন্ট ওয়ে ইন্সপেকটরের কর্তব্য (PWI) (Duties of Permanent Way Inspector):

নিম্নে পারমানেন্ট ওয়ে ইন্সপেকটরের কর্তব্যগুলো উদ্ধৃত করা হলো:

(i) নিয়ন্ত্রিত সকল অংশের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য দায়ী থাকা।

(ii) সময়ান্তে পুশ ট্রলিতে করে পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত ট্র্যাকে চিহ্নিত করা এবং মেরামতের ব্যবস্থা করা।

(iii) পরিদর্শনকালে মেরামতের রেল ও স্লিপারের ব্যবস্থা রাখা।

(iv) ক্ষতিগ্রস্ত রেলের তালিকা নিয়মিত প্রণয়ন করা।

(v) কমপক্ষে 1 বছরে একবার (শীতকালে) রেল জয়েন্টে লুব্রিক্যান্ট পরিকল্পনা নেয়া।

(vi) ক্রিপ ও গেজ সংশোধন, বাঁকে সুপার এলিভেশন যথাযথকরণ ইত্যাদির সুব্যবস্থা করা।
(vii) নিয়ন্ত্রিত সেকশনের ট্রাক পর্যাপ্ত স্থিতিস্থাপকতায় রাখার জন্য ব্যালাস্টের ব্যবস্থা করা।
(viii) নিয়ন্ত্রিত সকল কর্মচারীকে যৌথ সমন্বয়ে কাজ করার উপযোগী করে তৈরি করা, এদের মঙ্গল কামনা করা এবং যথাসময়ে বেতন ইত্যাদি পরিশোধের ব্যবস্থা করা।
(ix) গ্যাংমেটের কাজ তদারকী করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশাদী দান করা।
(x) দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দ্রুত উদ্ধার কাজের ব্যবস্থা নেয়া এবং দুর্ঘটনার কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্ত করা।
(xi) নিয়ন্ত্রিত সেকশনের বিস্তারিত পরিদর্শন রিপোর্ট বছরে এক বা দুবার তৈরি করা।

১১.৫ রেল সড়কে দুর্ঘটনার কারণসমূহ (Mention the Causes of Accident in Railway Track):

নিম্নলিখিত কারণে রেল সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে–

(i) **রেল কর্তৃপক্ষের ভুল সিদ্ধান্ত:** রেল কর্তৃপক্ষের লোকজন সঠিকভাবে কর্তব্য পালন না করার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সমর্থ হলে দুর্ঘটনা কমে যাবে।

(ii) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন– বন্যা, গুড়, ভূমিকম্প, ফাটল এবং ভূমিধস ইত্যাদি কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

(iii) **রেল সড়ক নির্মাণে ত্রুটিপূর্ণ উপাদান ব্যবহার:** রেলসড়ক নির্মাণে ত্রুটিপূর্ণ উপাদান ব্যবহারের ফলে ট্রেনের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে।

(iv) **লোকোমোটিভ এবং রোলিং স্টক ব্যর্থ হওয়ার ফলে:** ত্রুটিপূর্ণ লোকোমোটিভ ও রোলিং স্টক ডিজাইনের ফলে গিয়ার এক্সেল, ব্রেক হুইল প্রভৃতি ব্যর্থ হতে পারে এবং গাড়ি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়।

(v) অন্তর্ঘাতি কাজ: রেলকর্মীরা অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে রেল সড়ককে পথিমধ্যে ত্রুটিপূর্ণ করে রাখে। ফলে পূর্ণ গতিতে চলমান গাড়ি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়।

(vi) লেভেল ক্রসিং: লেভেল ক্রসিং এ কোনো গার্ড না থাকার জন্য রেল সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

(vii) গেজ বর্ধিত হওয়া: কাঠের স্লিপারের সাথে ফিটিংস, যেমন- ডগ স্পাইক দিয়ে বেলকে আটকানো হয়। ফিটিংসগুলো ঢিলা হয়ে গেলে গেজ মাপ বেড়ে যায় এবং গাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে দুর্ঘটনার কবলে পতিত হয়।

(viii) রেল সড়ক বেঁকে যাওয়া: স্লিপারের নিচে ব্যালাস্ট প্যাকিং দুর্বল হয়ে গেলে বা ফরমেশন লেভেল বসে গেলে সড়ক – লেভেল বিভিন্ন তলে অবস্থান করে। ফলে গাড়ি চলতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সুতরাং এ কারণেও দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে।

(ix) **সড়ক বাকলিং এর জন্য:** অতিরিক্ত ক্রিপের ফলে জয়েন্টে বাকলিং সৃষ্টি হয় এবং গাড়ি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়।

(x) **ব্রিজ ও কালভার্ট:** হঠাৎ করে ব্রিজ ও কালভার্ট ভেঙে গেলে গাড়ি দুর্ঘটনায় সম্মুখীন হয়।

(xi) **গঠন বা ফরমেশন:** ট্র্যাকের নিচের ব্যবহৃত মাটির সংকোচন ও প্রসারণ কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

১১.৭ রেলসড়ক রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নামের তালিকা (List the Name of Tools Required for Maintenance Work) রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়–

নাম	ব্যবহার
(১) বীটার কামপিক অ্যাক্স (গোদানো যন্ত্র)	স্লিপারের নিচে ব্যালাস্ট প্রবেশ করানো হয়।
(২) রেল গেজ	রেলগেজ যাচাই করা হয়।
(৩) ক্যান্ট বোর্ড	ক্যান্ট বা সুপার এলিভেশনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।
(৪) শাবল	ব্যালাস্ট স্থানান্তরের কাজে ব্যবহৃত হয়।

নাম	ব্যবহার
(৫) স্পেনার	ফিসবোল্ট টাইট্ লুজ করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
(৬) কোদাল–	ব্যালাস্ট সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।
(৭) ব্যালাস্ট স্ক্রীন	ব্যালাস্ট চালুনির কাজ করা হয়।
(৮) ওয়ার ব্রো	ব্যালাস্ট পরিষ্কার ও স্থানচ্যুত করা হয়।
(৯) জিম স্ক্রু	রেলকে সোজা ও বাঁকানো হয়।
(১০) অগার	স্পাইক বসানোর জন্য ছিদ্র করা হয়।
(১১) চিজেল	রেল বোল্ট ইত্যাদি কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়।

নাম	ব্যবহার
(১২) লিফটিং জ্যাক	সড়ককে লিফট করার কাজে ব্যবহার করা হয়।
(১৩) রেল টং	রেলকে উপরের দিকে উঠানো হয়।
(১৪) স্পিরিট লেভেল	সড়ক রেলের সমতা যাচাই করা হয়।
(১৫) ক্রো বার	এর সাহায্যে রেলকে সম্পন্ন নড়াচড়া করিয়ে সড়কের রেখাভুক্তি ঠিক করা হয়। স্লিপার হতে ডগ স্পাইক উঠানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।
(১৬) স্লিপার টং	স্লিপারকে উপরের দিকে উঠানো হয়।

নাম	ব্যবহার
(১৭) স্লেজ হ্যামার	হেভী কাজে অর্থাৎ রেল কাঠের কাজে ব্যবহৃত হয়।
(১৮) ক্র্যাডজ (কুড়াল)	কাঠের স্লিপার কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়।
(১৯) স্মাটইস রেল	বাঁকে ভিতরের এবং বাইরের রেলের সমতা নিরূপণ করা।
(২০) হ্যান্ড হ্যামার	স্পাইক পোঁতার কাজে ব্যবহৃত করা হয়।

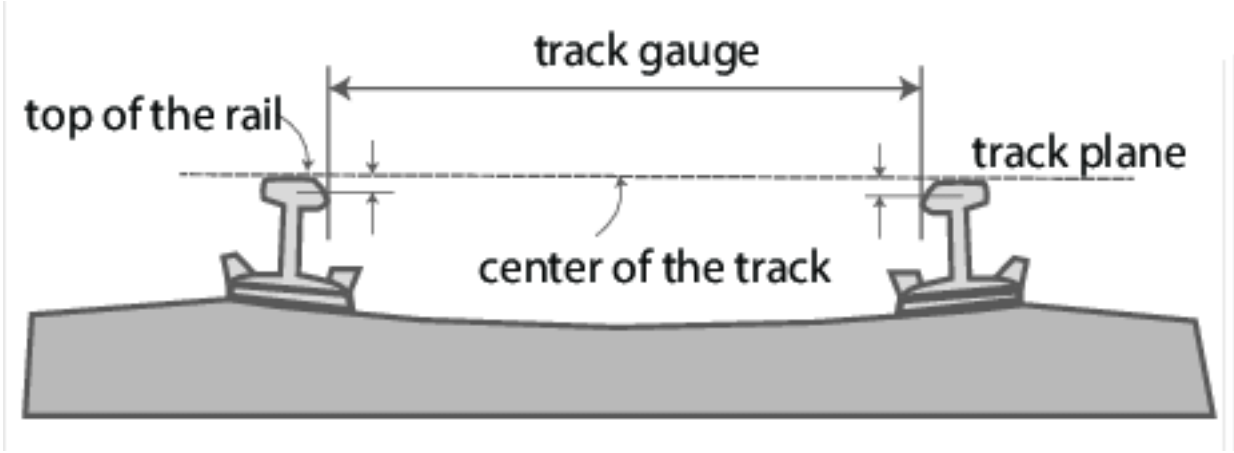

চিত্র: রেল গেজ

চিত্র: স্পেনার

চিত্র: কোদাল

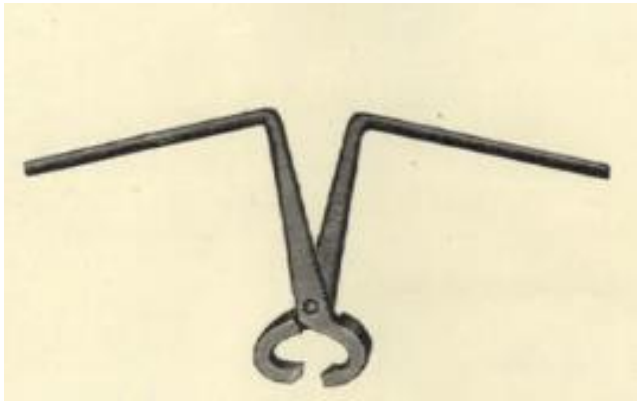

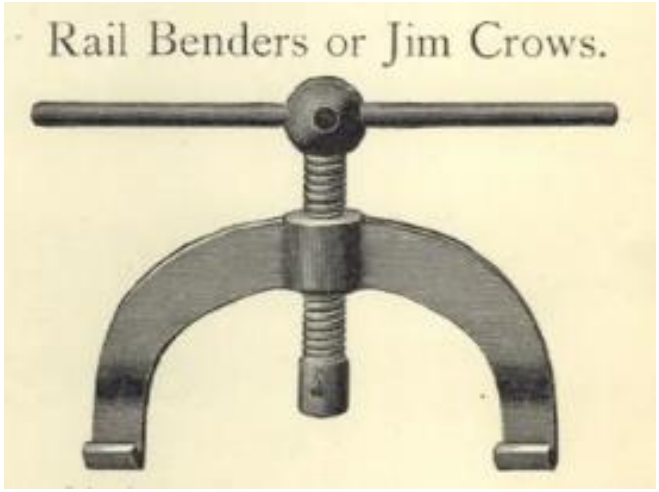

চিত্র: রেল বেন্ডার (Jim Crow)

চিত্র: আগর(Auger)

চিত্র: সোভেল

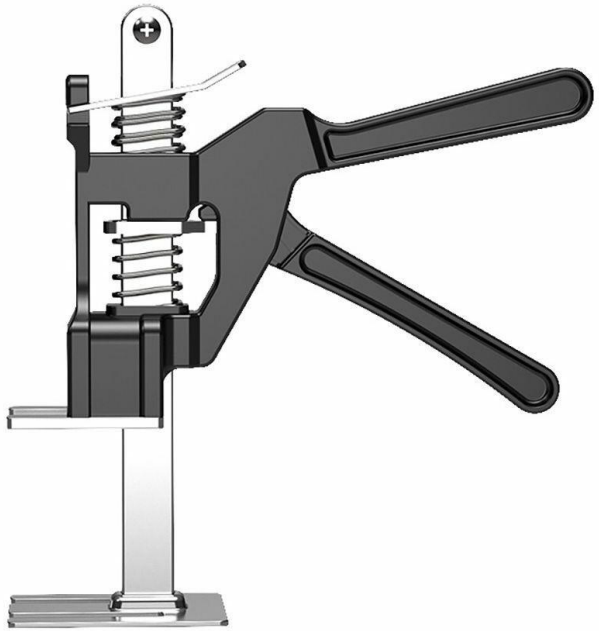

চিত্র: লিফটিং জ্যাক

ছিত্র: Wrench and Socket

ছিত্র: Tie Plug Punch

ছিত্র: Switch Broom

চিত্র: Cross Cut Chisel

দ্বাদশ অধ্যায়
পোতাশ্রয় এবং বন্দরের মৌলিক ধারণা

১২.১ পোতাশ্রয় এবং বন্দর
(State the Meaning of Harbor and Port) :

১২.১.১ হারবার (Harbour) বা পোতাশ্রয়
(State the Meaning of Harbour)

পোতাশ্রয় হচ্ছে সমুদ্র উপকূলের আংশিক পরিবেষ্টিত জল এলাকা যেখানে জাহাজ নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে। পোতাশ্রয়ের অভ্যন্তরভাগ সমুদ্রস্রোত, সমুদ্রের ঢেউ, ঝড়-ঝাপটা প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকে। পোতাশ্রয় সাধারণত সমুদ্র উপকূলের ভাঙা (ভগ্ন) অংশে গড়ে ওঠে।

আমাদের দেশের চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দরেও পোতাশ্রয় আছে। পোতাশ্রয় উন্নত ও সমৃদ্ধ মানের হলে বন্দরের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আর বরফ, কুয়াশা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত ভগ্ন, গভীর ও প্রশস্ত সমুদ্র উপকূল ইত্যাদির উপর পোতাশ্রয়ের উন্নতি নির্ভর করে। পোতাশ্রয়ের নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া গেলে আন্তর্জাতিক রুটের বৃহৎ জাহাজগুলি পোতাশ্রয় ব্যবহারে আকৃষ্ট হয় এবং বন্দরের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

১২.১.২ বন্দর
(State the Meaning of Port):

নদী বা সমুদ্র পথে চলাচলকারী লঞ্চ, স্টিমার, জল জাহাজ ইত্যাদির দ্বারা রাহিত মালামাল বা যাত্রী সাধারণ যে স্থানে উঠানামা করে তাকে বন্দর (Port) বলে। অন্যভাবে বলা যায় বন্দর হলো স্থলভাগ ও জলভাগের সন্ধিস্থলে অবস্থিত এমন একটি স্থান, যেখানে স্টিমার বা জাহাজ হতে মালামাল ও যাত্রী উঠাবার-নামাবার ব্যবস্থা থাকে। বন্দর মূলত স্থলভাগ ও জলভাগের তোরণ হিসেবে কাজ করে।

পোর্ট একটি পোতাশ্রয় যেখানে টার্মিনাল সুবিধাগুলো থাকবে। টার্মিনাল সুবিধাগুলো নিম্নরূপ-

(i) জাহাজে যাত্রী এবং মালামাল উঠানামার জন্য ঘাট এবং জেটির ব্যবস্থা থাকবে।

(ii) জাহাজ থেকে মালামাল নামার পর রাখার জন্য ছাউনির ব্যবস্থা থাকবে।

(iii) জাহাজ থেকে মাল খালাস করার পর অধিক সময় রাখার মতো ব্যবস্থা থাকবে।

সুতরাং পোর্ট হলো সেই পোতাশ্রয় যার সাথে বিভিন্ন প্রকার টার্মিলান সুবিধা রেলওয়ে হাইওয়ে, অভ্যন্তরীণ নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন প্রকার আনুমানিক সার্ভিস ব্যবস্থা থাকবে। বাংলাদেশে মংলা ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর রয়েছে।

১২.২ পোতাশ্রয় এবং বন্দরের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা (Mention the Purposes and Utility of Harbor and Port):

১২.২.১ পোতাশ্রয়ের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা (Mention the Purpose and Utility of Harbour)

নিচে পোতাশ্রয়ের উদ্দেশ্যগুলো দেওয়া হলো:

(i) জাহাজকে নিরাপদ আশ্রয় দানের জন্য।
(ii) সমুদ্রস্রোত, ঝড়-ঝাপটা প্রভৃতি থেকে জাহাজকে রক্ষার জন্য।
(iii) জাহাজ মেরামত ও জ্বালানি সংগ্রহের জন্য।
(iv) জাহাজ থেকে মালামাল উঠানামার জন্য।
(v) আর্ন্তজাতিক রুটের জাহাজকে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা।

নিচে পোতাশ্রয়ের উপযোগিতাগুলো দেওয়া হলো:

(i) প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত নিরাপদ পোতাশ্রয়ে অধিক সংখ্যক দেশি ও বিদেশি জাহাজকে প্রবেশের সুযোগ দানের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

(ii) উন্নতমানের পোতাশ্রয় রপ্তানি বাণিজ্যে সহায়ক।

(iii) বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য সহজে ও স্বল্প খরচে পশ্চাদভূমিতে (Interland) সরবরাহ করা সহজতর।

(iv) উন্নত পোতাশ্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত কর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনলে দেখা যায় যে, কোন দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়নে উন্নত ও আদর্শ পোতাশ্রয়ের উপযোগিতা অপরিসীম।

১২.৩ পোতাশ্রয় এবং বন্দরের প্রকারভেদ উল্লেখ
(Mention Different Types of Harbor and Port):

১২.৩.১ পোতাশ্রয়ের প্রকারভেদ
(Mention Different Types of Harbour)

হারবারের প্রকারভেদ নিম্নরূপ:

(i) প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় (Natural Harbour)
(ii) আধা প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় (Semi Natural Harbour)।
(iii) কৃত্রিম পোতাশ্রয় (Artificial Harbour)।

কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে পোতাশ্রয় নিম্নরূপ:

(i) সামরিক পোতাশ্রয় (Military Harbour)।
(ii) বাণিজ্যিক পোতাশ্রয় (Commercial Harbour)।
(iii) আশ্রয় পোতাশ্রয় (Shelter Harbour)
(iv) মাছ ধরার পোতাশ্রয় (Fishing Harbour)।

বাণিজ্যিক পোতাশ্রয় (Commercial Harbour) আবার দুই ধরনের। যথা:

(১) মিউনিসিপ্যাল পোতাশ্রয় (Municipal Harbour)
(২) ব্যক্তিগত (Personal Harbour)।

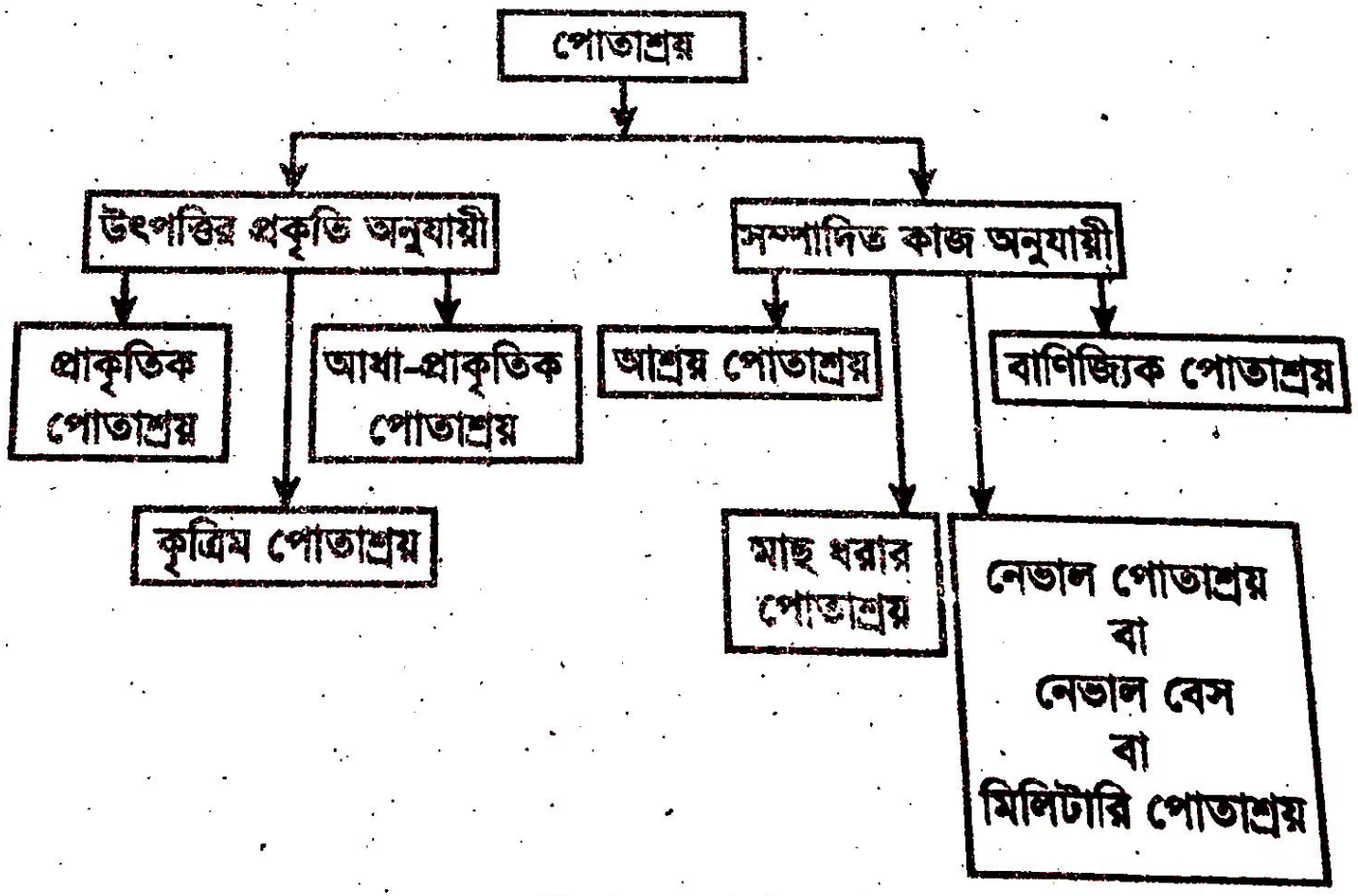
পোতাশ্রয়
উৎপত্তির প্রকৃতি অনুযায়ী
সম্পাদিত কাজ অনুযায়ী
প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়
আধা-প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়
আশ্রয় পোতাশ্রয়
বাণিজ্যিক পোতাশ্রয়
কৃত্রিম পোতাশ্রয়
মাছ ধরার পোতাশ্রয়
নেভাল পোতাশ্রয় বা নেভাল বেস বা মিলিটারি পোতাশ্রয়

চিত্র- ১২.১

১২.৩.২ বিভিন্ন ধরনের বন্দর (Classify Different Types of Port):

নিচে বিভিন্ন ধরনের বন্দরের নাম উল্লেখ করা হলো:

১। করপ্রাপ্তি অনুযায়ী বন্দর দুই প্রকার। যথা–

(ক) মুক্ত বন্দর
(খ) গমনাগমন বন্দর।

২। বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বন্দর তিন প্রকার। যথা–

(ক) রপ্তানি বন্দর
(খ) আমদানি বন্দর
(গ) আড়তদারি বন্দর।

৩। অবস্থিতি অনুযায়ী বন্দর তিন প্রকার। যথা-

(ক) হ্রদ বন্দর
(খ) নদী বন্দর
(গ) সামুদ্রিক বন্দর।

৪। সামুদ্রিক বন্দর দুই প্রকার। যথা-
(ক) অবস্থায় অনুযায়ী বন্দর
(খ) পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বন্দর।

৫। অবস্থান অনুযায়ী বন্দর চার প্রকার। যথা-

(ক) খাল বন্দর
(খ) খাড়ি বন্দর
(গ) মোহনা বন্দর
(ঘ) উপসাগরীয় বন্দর।

৬। পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বন্দর দুই প্রকার। যথা-

(ক) প্রাকৃতিক বন্দর
(খ) কৃত্রিম বন্দর।

নিচে বিভিন্ন ধরনের বন্দর ছক আকারে উল্লেখ করা হলো:

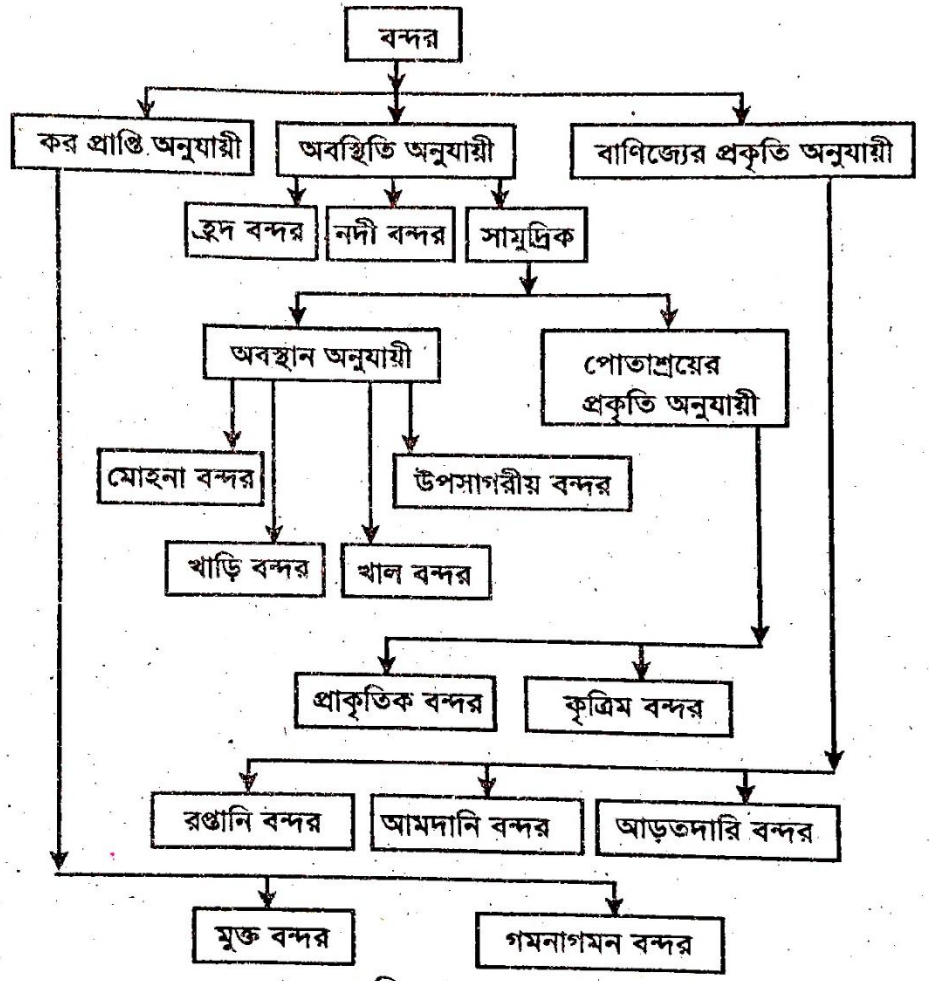
বন্দর
কর প্রাপ্তি অনুযায়ী
অবস্থিতি অনুযায়ী
বাণিজ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী
হ্রদ বন্দর
নদী বন্দর
সামুদ্রিক
অবস্থান অনুযায়ী
পোতাশ্রয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী
মোহনা বন্দর
উপসাগরীয় বন্দর
খাড়ি বন্দর
খাল বন্দর
প্রাকৃতিক বন্দর
কৃত্রিম বন্দর
রপ্তানি বন্দর
আমদানি বন্দর
আড়তদারি বন্দর
মুক্ত বন্দর
গমনাগমন বন্দর

চিত্র- ১২.২

১২.৫ প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়, আধা-প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়, কৃত্রিম পোতাশ্রয়, মিলিটারি পোতাশ্রয়, বাণিজ্যিক পোতাশ্রয়, গমনাগমন পোর্ট, মহাসাগর বন্দর, আন্তঃদেশীয় পোর্ট, যুক্ত পোর্ট, অ্যাংকারেজ এলাকা, মেরিন টার্মিনাল এবং টার্নিং বেসিনের সংজ্ঞা
(Describe the Following Terms: Natural Harbor, Semi-Natural Harbor, Artificial Harbor, Military Harbor, Commercial Harbor, Port of Entry, Ocean Port, Inland Waterway Port, Free Port, and Anchorage Area, Marine Terminal and Turning Basin):

(i) **প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় (Natural Harbour):** যেখানে সমুদ্রের তটরেখা শুগ্ন এবং নিকটে পানির গভীরতা বেশি সেখানে প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ের প্রবেশ পথ সংকীর্ণ অথচ গভীর হয় এবং অভ্যন্তরভাগ সুবিস্তৃত ও গভীর জলরাশি থাকে। এরূপ পোতাশ্রয়ে জাহাজ নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে এবং সাথে সাথে মালামালও উঠানামা করতে পারে। যেমন- নিউইয়র্ক, সানফ্রান্সিসকো, রিওডিজেনিরিও ইত্যাদি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরতম ও প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়।

(ii) আধা-প্রাকৃতিক পোতাশ্রয় (Semi-Natural Harbour): এই পোতাশ্রয়ের দুই পার্শ্বে উঁচু ভূমি দ্বারা ঘেরা থাকে। কিন্তু এ ধরনের পোতাশ্রয়ের প্রবেশ পথে কৃত্রিম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে এবং অন্যান্য সমুদয় ব্যবস্থা প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ের ন্যায় যেমন। প্লাইমাউথ, চেরবার্গ ইত্যাদি বিখ্যাত সেমি ন্যাচারাল পোতাশ্রয়।

(iii) কৃত্রিম পোতাশ্রয় (Artificial Harbour): এই ধরনের পোতাশ্রয় মানুষ কৃত্রিমভাবে তৈরি করে নেয়। এই ধরনের ← পোতাশ্রয় ড্রেজিং করে তৈরি করা হয়। যা সমুদ্রস্রোত এবং কড়-ঝাপটা ব্রেক ওয়াটার দ্বারা প্রতিরোধ করা হয়। যেমন। বাফেলো, হামবুর্গ, মাতায়ানি ইত্যাদি হচ্ছে কৃত্রিম পোতাশ্রয়। কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের লে-আউট।

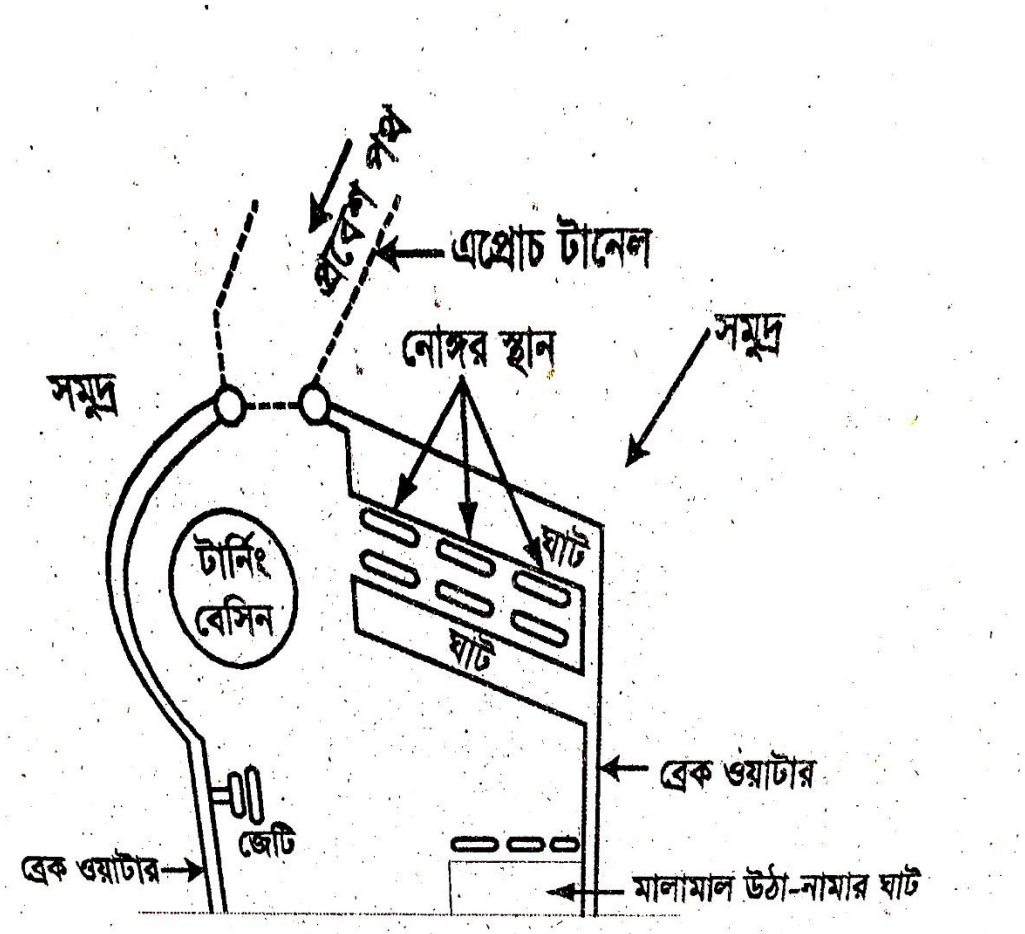

চিত্র- ১২.৩ : কৃত্রিম পোতাশ্রয়ের লে-আউট

(iv) মিলিটারি পোতাশ্রয় (Military Harbour): বা লেভেল পোতাশ্রয়। এ ধরনের পোতাশ্রয় নৌবাহিনীর ব্যবহারের জন্য নির্মাণ হয়ে থাকে। নৌঘাটিতে মালামাল সরবরাহে এ পোতাশ্রয় ব্যবহার হয়ে থাকে।

(v) বাণিজ্যিক পোতাশ্রয় (Commercial Harbour): এই পোতাশ্রয়ে প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ ডক থাকবে সেখান থেকে কার্গোতে মালামাল বোঝাই এবং খালাস করা হয়। এই ধরনের পোতাশ্রয় সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীনও হতে পারে। এই প্রকার পোতাশ্রয়ে বৃহৎ থাকার পায়ার থাকবে তাতে জাহাজ নোঙ্গর করে মালামাল বোঝাই ও খালাস করা যাবে। যেমন– নিউইয়র্ক, লস এঞ্জেলস, লন্ডন, ভেনিজুয়েলা ইত্যাদি।

(vi) গমনাগমন পোর্ট (Port of Entry): এটি একটি সুনির্দিষ্ট এলাকা যেখানে বিদেশি মালামাল এবং বিদেশি নাগরিককে শুল্ক অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

১২.৬ বন্দরের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
(Mention the Point to be Considered in Selecting the Site for a Port)

(১) সামুদ্রিক বন্দরের জন্য স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

(i) ভগ্ন তটরেখার খাড়ি অত্যন্ত গভীর হয় বিধায় বন্দরের জন্য এটি বেশ উপযোগী। কেননা এতে বড় বড় জাহাজের বন্দরে ভিড়া সহজ হয়।

(ii)বন্দরের জন্য পানির গভীরতা পর্যাপ্ত হওয়া আবশ্যক। এতে জাহাজ নোঙ্গর করা, মালামাল উঠানো-নামানো সহজ হয়।

(iii) বন্দরের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংলগ্ন কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ের স্থানের বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

(iv) জাহাজ নির্মাণ, মেরামত ও জেটি নির্মাণের জন্য বন্দরের আশপাশের এলাকায় প্রয়োজনীয় সমতল ভূমি থাকতে হবে। এছাড়া গুদাম, পরিবহন ব্যবস্থা ও শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত সমভূমি থাকা দরকার।
(v) বন্দরের স্থান নির্বাচনে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে। এক বন্দরের জন্য স্থান নির্বাচনে প্রাপ্ত আয় (কর, শুল্ক) ও বিনিয়োগ এর বিষয় বিবেচনা করতে হবে।
(vi) পশ্চাৎভূমিতে আমদানি পণ্য সরবরাহ এবং রপ্তানির পণ্য সংগ্রহের জন্য উত্তম পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ সম্পন্ন স্থানে বন্দরের স্থান নির্বাচন করতে হবে।

(vii) মানুষের বসবাস উপযোগী জলবায়ু সম্পন্ন এলাকায় বন্দরের স্থান নির্বাচন করতে হবে।

(viii) বন্দরের স্থান নির্বাচনে পশ্চাৎভূমির জনসংখ্যা ও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে।

(xi) কুয়াশা ও বরফমুক্ত স্থানে বন্দরের স্থান নির্বাচন করতে হবে।

(২) নদী বন্দরের জন্য স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

(i) নদীপথ সোজা-সরল কিনা দেখতে হবে।
(ii) নদীর চওড়া ও গভীরতা বিবেচনা করতে হবে।

(iii) নদীতে জোয়ার-ভাটা হয় কিনা এবং এতে জাহাজ ও লঞ্চের চলাচল কী কী সুবিধা হতে পারে।

(iv) বন্দরের উপযোগী গভীরতায় পানি সারা বছর থাকে কিনা বিবেচনা করে বন্দরের স্থান নির্বাচন করতে হবে।

(v) নদীতে চর পড়ার বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।

(vi) বন্দরের সাথে উত্তম যোগাযোগ, গুদাম নির্মাণ, জাহাজ মেরামত, মালামাল খালাস ও বোঝাই এর ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

(vii) বন্দরে পর্যাপ্ত জ্বালানি পাওয়া যাবে কিনা তাও বিবেচনায় আনতে হবে।

(viii) বন্দরের স্থানের আবহাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত কিনা তাও বিবেচনায় আনতে হবে।

(ix) নদীর বন্দরের জন্য পশ্চাৎভূমির জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে।